ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন

এম শমশের আলী

ইসলাম
বিজ্ঞান
মেডিটেশন

এম শমশের আলী

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
www.quantummethod.org.bd

ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন

এম শমশের আলী

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,

শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩৯৬৮১৫, ৮৩৯১৩৯১, ০৯৬১৩-০০২০২৫

০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭৪০-৬৩০৮৫৬, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮

E-mail : info@quantummethod.org.bd

প্রথম প্রকাশ

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

মুদ্রাকর

উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার

ইসলাম ভবন (২য় তলা)

৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড,

ঢাকা-১০০০

মূল্য

২০০ টাকা

Islam Biggan Meditation

(Islam Science Meditation)

Published by

Quantum Foundation

www.quantummethod.org.bd

Price : 15 $

উৎসর্গ

স্রষ্টার স্মরণে ধ্যানমগ্ন
সকল সাধককে

সূচিপত্র

॥ ৭ ॥
ভূমিকা

॥ ১১ ॥
দুঃখক্লিষ্ট মানুষের মনে শান্তির বাণী পৌঁছে দিয়েছে কোয়ান্টাম

॥ ১৪ ॥
আল্লাহ মানুষকে ধার্মিক হতে বলেছেন, ধর্মান্ধ নয়

॥ ১৭ ॥
কৃতজ্ঞচিত্ততাই কোয়ান্টামের মূল কথা

॥ ১৯ ॥
সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেবে জীবন

॥ ২৫ ॥
সুফিদের বিজ্ঞান ভাবনা

॥ ৪২ ॥
সমগ্র মানব সম্প্রদায় এক পরিবার

॥ ৫০ ॥
কোরআনের শিক্ষা মানুষকে আলোকিত জীবনের পথে পরিচালিত করে

॥ ৬১ ॥
কোনো মুসলমান সাম্প্রদায়িক হতে পারে না, সাম্প্রদায়িক লোক মুসলমান হতে পারে না

॥ ৭৩ ॥
আত্ম উন্নয়নের জন্যে চাই নিজেকে জানা

॥ ৮১ ॥
মন নিয়ন্ত্রণের বিশ্বজনীন প্রক্রিয়া কোয়ান্টাম মেথড

॥ ৯৪ ॥
শুদ্ধ নিয়ত কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করে

॥ ৯৯ ॥
রসুলের জীবনাদর্শ অনুসরণ ব্যক্তি ও সমাজকে সমৃদ্ধ করে

॥ ১০৮ ॥
বিশ্বমানের মানুষ হিসেবে তোমরা বেড়ে ওঠো

॥ ১১২ ॥
জ্ঞানী হও, পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়ো

॥ ১১৬ ॥
ভবিষ্যতে মহাকাশ গবেষণায় নেতৃত্ব দিতে হবে

॥ ১২০ ॥
হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করছে কোয়ান্টাম

॥ ১২৫ ॥
সৎকর্ম : মুক্তির পথ

প্রকাশকের কথা

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতিমান ও বরেণ্য বিজ্ঞানী ড. এম শমশের আলী। একাধারে তিনি শিক্ষাবিদ লেখক গবেষক ধর্মতাত্ত্বিক ও টিভি-ব্যক্তিত্ব। আমাদের দেশে গত কয়েক দশকে বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা আমরা সবাই জানি, বিশেষত পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র-তত্ত্বের অনবদ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং এর সাথে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ও জীবনের বাস্তব ঘটনাগুলোর সাদৃশ্য তিনি সাধারণের সামনে উপস্থাপন করেছেন সহজ সাবলীল ভাষায়। এছাড়াও বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন ব্যাখ্যায় তার সুগভীর ও সহজাত পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। এবং এর পাশাপাশি আন্তঃধর্মীয় ও সার্বজনীন সম্প্রীতি রচনার ক্ষেত্রে তিনি একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। সবমিলিয়ে বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুবিধ শাখায় তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাকে করে তুলেছে বিশিষ্ট ও অনন্য।

দুই দশক ধরে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই গুণীজন। স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনা করেছেন বিজ্ঞান ইসলাম মেডিটেশন আধ্যাত্মিকতাসহ নানা বিষয় এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে কোয়ান্টাম চেতনার উপযোগিতা নিয়ে। সেই সূত্রে ফাউন্ডেশনকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, বিভিন্ন আঙ্গিকে। যার প্রমাণ মেলে তার বহুমাত্রিক আলোচনা ও কোয়ান্টাম বুলেটিনে দেয়া সাক্ষাৎকারে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, পরম করুণাময়ের অনুগ্রহ আর কোয়ান্টামের প্রতি সদাস্নেহার্দ্র এ মানুষটির আন্তরিক সহযোগিতার ফলে আমরা তার বৈচিত্র্যঋদ্ধ আলোচনা ও সাক্ষাৎকারগুলো মলাটভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, *ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন* বইটি আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠককে আলোকিত জীবনদৃষ্টি অর্জনে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করবে। প্রাণিত করবে ধ্যান, জ্ঞান ও মানবিকতার পথে এগিয়ে যেতে।

সবার সুস্বাস্থ্য, প্রশান্তি ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।

ভূমিকা

কোয়ান্টামের প্রতি আমার আগ্রহ ও আকর্ষণ বহুদিনের। এর কারণ যে শুধু কোয়ান্টাম মেথডের কার্যকারিতা, তা নয়; এ মেথডটি প্রবর্তনের নেপথ্যে যে মানুষটি নীরবে নিঃশব্দে সবাইকে শারীরিক ও নৈতিক চালিকাশক্তি ব্যবহারের তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন, তাকে আমি অনেকদিন ধরে চিনি। গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক বহুকাল ধরে গবেষণা করছেন–মন ও দেহ নামক গাড়িটিকে সুন্দরভাবে চালাতে হলে কী করে মানুষকে তার নিজের ড্রাইভিং সিটে বসতে হবে, তা নিয়ে। আর সেই কলাকৌশলটি তিনি সবাইকে শিখিয়ে চলেছেন কোয়ান্টাম মেথডের সাহায্যে।

আমাদের দেশের মানুষ ও পাশ্চাত্য জগতের মানুষের দুঃখকষ্ট একটু ভিন্ন রকমের। পাশ্চাত্যে জিনিসের কষ্ট নেই, মনের কষ্ট আছে। আর আমাদের অধিকাংশের মধ্যে মনের কষ্ট নেই, কিন্তু জিনিসের কষ্ট আছে। হালে অবশ্য কনজ্যুমারিজমের প্রভাবে আমাদেরও মনের কষ্ট বেড়ে চলেছে, এর ফলে নানারকম রোগও দেখা দিচ্ছে। এই রোগগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এগুলো যতটা না দেহের, তার চেয়ে বেশি মনের। এ কষ্ট দূর করতে তাই ওষুধের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আছে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবার। প্রয়োজন আছে আত্মস্থ হবার। প্রয়োজন সঠিক ব্রেনওয়েভ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবার। কোয়ান্টাম এ কাজটিই সুচারুরূপে করে। আর তাই সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন–এটাই হওয়া চাই আমাদের সকলের আরাধ্য বিষয়।

এই পদ্ধতির সঙ্গে ইসলাম ও স্রষ্টায় ধ্যানমগ্নতার একটা সাযুজ্য আছে। আমিও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে গিয়ে আত্মবিকাশের পথে এ কথাগুলোই বিভিন্নভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। কোয়ান্টাম আমার কথাগুলোই একসঙ্গে গেঁথে একটি গ্রন্থের রূপ দিয়েছে। এজন্যে আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কাছে এবং গুরুজী ও মা-জীর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এদের স্বপ্ন আমাকে নাড়া দিয়েছে। এ স্বপ্ন আকাশকুসুম কল্পনাকে ঘিরে নয়, বরং ধূলিধরার মানুষকে ঘিরে। লামাতে গিয়ে আমি এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের কিছু পরিচয় পেয়েছি। শতাব্দীর বঞ্চনা নিয়ে যে মানুষগুলো বাস করছিল একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে, সেখানে তাদেরকে মনুষ্যত্বের শীর্ষধাপে পৌঁছে দেয়ার যে নিরলস প্রচেষ্টা তারা করছেন, প্রকৃত অর্থেই তা স্রষ্টাসেবার কাজ।

স্রষ্টার প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে আর মানুষকে দিয়ে মানুষের কল্যাণ সাধনের যে চেষ্টা কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন করে চলেছে, আমি তার সর্বাধিক সাফল্য কামনা করি।

এম শমশের আলী

ইসলাম
বিজ্ঞান
মেডিটেশন

দুঃখক্লিষ্ট মানুষের মনে শান্তির বাণী পৌঁছে দিয়েছে কোয়ান্টাম

'কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন' নামটাকে আমার কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। কোয়ান্টাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পরিমাণ। কিন্তু একজন পদার্থবিদ হিসেবে 'কোয়ান্টাম' শব্দের গুরুত্ব আমার কাছে আরো বেশি। কারণ দৃশ্যজগতে সবকিছু একই রকম হলেও বিজ্ঞানের চোখে বড় জিনিসের জগত আর ছোট জিনিসের জগত এক নয়। Laws of the small are different from the laws of the large.

যেমন, দৃশ্যজগতে শক্তিকে আমরা দেখি নিরবচ্ছিন্ন হিসেবে। কৌণিক ভরবেগ, এঙ্গুলার মোমেন্টাম–সবকিছুই নিরবচ্ছিন্ন। কিন্তু আমরা যদি ছোট জিনিসের জগতে যাই, তাহলে দেখব, সেখানে পদার্থের অণুরা যে গতি বিনিময় করছে তা নিরবচ্ছিন্ন নয়। থোকায় থোকায়, গুচ্ছে গুচ্ছে চলে এ শক্তি দেয়া-নেয়ার কাজ। আর এটাই কোয়ান্টাম মেকানিক্স।

এখন আমরা যদি আমাদের দেহের দিকে তাকাই, তবে দেখব, আমাদের সমস্ত চেতনার মূল হলো নিউরোন। এটি অতিসূক্ষ্ম। আর এ নিউরোনগুলো যে প্রক্রিয়ায় কাজ করে, তা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আওতায়ই পড়ে। সুতরাং 'কোয়ান্টাম' নাম দেয়াটা খুব যথার্থ হয়েছে। কারণ কোয়ান্টাম শেখায়, আত্মমগ্নতার মধ্য দিয়ে চেতনার গভীর থেকে একজন মানুষ কীভাবে পাবে তার অশান্তি, অসুস্থতা আর ব্যর্থতার বৃত্ত ভাঙার পথ। কোয়ান্টাম শেখায়, দেহ-মনের অফুরন্ত শক্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে কীভাবে একজন মানুষ তার কাজে লাগাতে পারে।

দুঃখক্লিষ্ট মানুষের মনে শান্তির বাণী পৌঁছানো, আত্মবিশ্বাস জোগানো–এটাই হলো তার জন্যে সবচেয়ে বড় সেবা। অর্থ দিয়ে এর কোনো পরিমাপ হয় না। গত ১৭ বছর ধরে নিরলস সেবার মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম এখন ৩০০ তম ব্যাচ সম্পন্ন করেছে। নিঃসন্দেহে এ এক মাইলফলক। কারণ মেডিটেশন কোর্সের মতো একটি বিষয়, যে-সম্পর্কে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো

ধারণা ছিল না–এর ৩০০ তম কোর্স হওয়াটাই প্রমাণ করে, এ কোর্স মানুষের জীবনে কোথায় স্থান করে নিয়েছে। একজন এসেছে, উপকার পেয়েছে; তার বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়কে বলেছে, নিয়ে এসেছে তাকেও। এভাবেই তো এগিয়েছে কোয়ান্টাম চেতনা।

মোরাকাবা, তাফাক্কুর, ধ্যান, মেডিটেশন–এটা ইসলামের একটা উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। যেমন : নামাজ। মুসলমানদের দৈনন্দিন এ ফরজ ইবাদতটি আসলে ধ্যান এবং যোগাসনের একটি যুগপৎ উপযোগিতা। আমরা যখন নামাজ পড়ি, দুনিয়ার সমস্ত কোলাহল থেকে দূরে সরে গিয়ে নিবিষ্টচিত্তে স্রষ্টার কাছে আত্মনিবেদন করি। হয়তো স্রষ্টাকে দেখছি না, শুনছি না; কিন্তু তিনি আমাকে দেখছেন, আমাকে শুনছেন–এই যে নিবিষ্টচিত্তে কল্পনা আর একাগ্রচিত্ততা–এটাই তো ধ্যান।

একবার হযরত আলী (রা)-এর পায়ে তীর বিঁধল। প্রচণ্ড ব্যথায় তিনি কাতরাচ্ছেন। কয়েকজন সাহাবী তীর খুলতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তীরে হাত দিলেই আলী (রা) ব্যথায় চিৎকার করে ওঠেন। রসুল (স) বললেন, আলী যখন নামাজে সেজদায় যাবে তখন তীরটা খুলে নিও। কারণ নামাজে সে এতই নিমগ্ন থাকবে যে, ব্যথা কিছুই টের পাবে না। তা-ই হলো। আলী (রা) নামাজে দাঁড়ালেন। তীর খুলে নিলেন সাহাবীরা। তিনি টেরই পেলেন না।

মোবাইল ফোনের এ যুগে এক দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের আরেক দেশে সরাসরি কথা বলা, কথা শোনা খুব দৈনন্দিন একটি ব্যাপার। একসময় এটা যতই অকল্পনীয় ব্যাপার হোক না কেন, এখনকার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে আমরা জানছি যে, কলারের মোবাইল থেকে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল ট্রান্সমিট হচ্ছে। সেই সিগন্যালটা রিসিভড্ হচ্ছে রিসিভারের মোবাইলে। আর সেটা সম্ভব হচ্ছে কলার এবং রিসিভারের মধ্যে একটা বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউনিং হচ্ছে বলে।

একইভাবে বান্দা যদি আল্লাহকে ডাকতে পারে, টিউনিংটা যদি ঠিকভাবে হয়, তখন স্রষ্টার সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে যায়। এজন্যে অলি-আউলিয়ারা ধ্যানের পরামর্শ দিয়ে গেছেন। নিবিষ্টচিত্তে যিনি ধ্যান করেন, তিনিই বুঝতে পারেন যে, কীভাবে ধ্যান করলে আল্লাহর সঙ্গে তার একটা সংযোগ হবে। এ যোগাযোগ বাইরের মানুষ টের পায় না। সে-রকম এই বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে–যিনি আমাদের প্রভু, যিনি আমাদের প্রতিপালক, যিনি আমাদের জীবনের সবকিছুর বিধায়ক–তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার একটি পদ্ধতি হচ্ছে ধ্যান।

নামাজে যোগাসন বা ব্যায়ামের উপকারিতাও আমরা লাভ করি। আমরা রুকুতে যাই, সেজদায় যাই, মাথা থেকে রক্ত চলাচল হয়। আমরা যখন আঙুলে গুনতে থাকি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ', তখন আমাদের হাতের আঙুলের কতগুলো পয়েন্টের যে কম্প্রেশন, তা রক্ত চলাচলকে স্বচ্ছন্দ করে। সুতরাং দৈহিক, আত্মিক, মানসিক–সবদিক দিয়ে নামাজ আমাদের উপকার করে। এভাবে ধ্যান থেকেও আমরা দৈহিক, মানসিক ও আত্মিকভাবে উপকৃত হই।

বিক্ষিপ্ততা আমাদের কাজের ক্ষমতা, দক্ষতা ও কার্যকারিতাকে ব্যাহত করে। অন্যদিকে কনসেনট্রেশন বা গভীর মনোনিবেশ আমাদের এনার্জি বা শক্তিকে ফোকাসিং করে এর সার্বিক কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে অনেক দুরূহ ও জটিল কাজও হয়ে যায় খুব সহজে। ধ্যান বা মেডিটেশনে মূলত এটিই হয়। বিশেষ একটি দিকে আমি আমার সমস্ত চিন্তাকে ধাবিত করছি–শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে এবং সে শক্তি দিয়ে সম্ভব হচ্ছে অনেক অভাবনীয় কাজ।

অর্থাৎ আল্লাহ একটা সিস্টেম দিয়েছেন, যদি বিশ্বাস জন্মে যে, এ সিস্টেমের কোনো ত্রুটি জয় করার ক্ষমতাও আল্লাহ দিয়েছেন, তাহলে কিন্তু আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ধ্যান এই আত্মবিশ্বাসকে অসাধারণভাবে জাগিয়ে তোলে। মেডিটেশনের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। মেডিটেশন মানুষকে শারীরিক এবং আত্মিকভাবে জাগ্রত করে, শক্তিশালী করে এবং তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে।

কোয়ান্টাম মেথড ৩০০ তম কোর্সপূর্তির প্রাক্কালে নেয়া সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন

আল্লাহ মানুষকে ধার্মিক হতে বলেছেন, ধর্মান্ধ নয়

পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আমার পড়াশোনার শুরুটা বেশ মজার। বাবা আমাকে বলেছিলেন ইংরেজি আর গণিতে ডাবল অনার্স নিয়ে পড়তে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম যেদিন গেলাম, কৌতূহলবশত কার্জন হলে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে উঁকি দিচ্ছিলাম। ভেতর থেকে এক গুরুগম্ভীর হাঁক–'কী চাই? এদিকে আসো।' বললাম, কার্জন হলটা একটু ঘুরে দেখছিলাম।

বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছি শুনে তিনি আমার কাগজপত্র দেখতে চাইলেন। তারপর বললেন, কাল সকালেই এসে ফিজিক্সে ভর্তি হয়ে যাও। কথাটা তিনি এমন আদেশের সুরে বললেন যে, ইংরেজি আর গণিতে ডাবল অনার্স করার চিন্তাটা মাথা থেকে উবে গেল। পরে জেনেছি, তিনিই পদার্থবিজ্ঞানের খ্যাতনামা অধ্যাপক ড. ইন্নাস আলী।

পরের দিনই পদার্থবিজ্ঞানে ভর্তি হয়ে গেলাম। বাবাকে লিখে জানালাম–বিজ্ঞানের ভাষা যেহেতু গণিত, তাই পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়লে গণিত তো পড়া হবেই, আর ইংরেজি আমি নিজেই পড়ে নেব। সত্যিই তা-ই করেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্কলারশিপের টাকা পেয়েই শেলী, কীট্স, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিনে পড়তে শুরু করলাম।

একজন বিজ্ঞানী গণিতবিদ চিকিৎসক প্রকৌশলী সংগীতজ্ঞ খেলোয়াড়–সবাই যার যার পেশা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিজ নিজ অঙ্গনে জীবনটা কাটিয়ে দেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, জীবন আসলে অনেক বড়, অনেক ব্যাপক। অনেক কিছুর সমন্বয়েই একটা পরিপূর্ণ মানবজীবন। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে এখানে মনুষ্যত্বের আরাধনা করতে হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গিই আমাকে জীবনের নানা পর্যায়ে একাধিক বিষয়ে উৎসাহী করে তুলেছে–পদার্থবিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, সংগীত, খেলাধুলা।

প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাশাপাশি বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠার পেছনে কয়েকজন শিক্ষকের উৎসাহ আমি পেয়েছিলাম। ড. কাজী মোতাহার

হোসেন তাদের অন্যতম। পরিসংখ্যানশাস্ত্র এদেশে যাদের হাত দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, তিনি তাদের একজন। ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও ছিল তার সুগভীর পাণ্ডিত্য। ভালো দাবা খেলতেন, টেনিস খেলতেন, গান গাইতেন। ছিলেন জাতীয় কবি নজরুলের একনিষ্ঠ বন্ধু। আমি তার খুব প্রিয় ছাত্র ছিলাম। খুব ভালবাসতেন আমাকে। আমার জীবনে তার অবদান অনেক।

আরেকজন মানুষের সাহচর্য আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি পাকিস্তানের নোবেলবিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনায় স্রষ্টার যে প্রজ্ঞাপ্রসূত পরিকল্পনা–এর নানা দিক ও বিশ্লেষণ তিনি আমাকে বলতেন। বিভিন্ন সময়ে শোনা তার এ কথাগুলো আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। ইতালির ট্রিয়েস্টে-তে তার প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স (আইসিটিপি), এখন যেটি তার নামে নামকরণ করা হয়েছে, নানা গবেষণাকর্মের সূত্রে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে ৪০ বছর ধরে আমার সম্পৃক্ততা ও নিয়মিত যাতায়াত।

এরকমই একবার আইসিটিপি-তে গেলাম। ১৯৭৮ সালের কথা। থাকি প্রফেসর গ্লাউকো ইয়েরেনেত্তি-র বাসায়। যেদিন ফিরে আসব–আমার ফ্লাইট ভোর পাঁচটায়। নাছোড়বান্দা ইয়েরেনেত্তি আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে।

সেদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ পড়ছি, এমন সময় দেখি–রুমের আরেক পাশে ইয়েরেনেত্তি হাত তুলে প্রার্থনা করছে। যা-ই হোক, সে যথারীতি আমাকে পৌঁছে দিল। প্লেনে উঠে হঠাৎ মনে হলো–আচ্ছা, আমি মুসলমান, আমি কার কাছে হাত তুলছিলাম; আর ইয়েরেনেত্তি খ্রিষ্টান, সে কার কাছে হাত তুলছিল? একটা অদ্ভুত অনুভূতিময় শিহরণ হলো আমার!

সেদিন গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম–এক স্রষ্টার অধীনেই আমরা সবাই পরিচালিত হচ্ছি, মহাবিশ্বের সবকিছু একই নিয়মে চলছে। তাই আমরা সবাই যদি স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস করি, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হই, মানুষকে ভালবাসি আর যার যার ধর্মের অমিল না খুঁজে মিলগুলো খুঁজে বের করি, তবে পৃথিবীটা সত্যিই একটা সুন্দর জায়গা হয়ে ওঠে। কারণ ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলোই তো একমাত্র বিষয় নয়, বরং প্রত্যেক ধর্মের কল্যাণচেতনা আর নির্যাসটাই সবচেয়ে বড় কথা।

একসময় ইসলাম সম্পর্কে পড়তে গিয়ে বুঝলাম–এ এক অপূর্ব খনি। আমরা নৈতিক মূল্যবোধের কথা বলি; আর এ নৈতিকতার একটি বড় উৎস হলো ধর্ম। এছাড়াও ধর্মের ব্যাপারে ইসলামে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি

আল্লাহ মানুষকে ধার্মিক হতে বলেছেন, ধর্মান্ধ নয়। কোরআনের শিক্ষা অনুসারে, কোনো মুসলমান সাম্প্রদায়িক হতে পারে না, আবার কোনো সাম্প্রদায়িক লোক মুসলমান হতে পারে না।

শুধু তা-ই নয়, ইসলাম ধর্মে মানুষের প্রতি যে সচেতনতা দেখানো হয়েছে, সেটি এককথায় অসাধারণ। সব ধর্মের, সব বর্ণের এবং দুস্থ নিগৃহীত নিপীড়িত মানুষের প্রতি যে ভালবাসা ও দায়িত্বের কথা এখানে বলা হয়েছে, তা অভূতপূর্ব। কোরআনে বার বার বলা হয়েছে, সৃষ্টির সেবাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ এবং এর মাঝেই আছে প্রকৃত সুখ। উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আর অসাম্প্রদায়িক চেতনার একটি অনন্য উদাহরণ এটি।

পৃথিবীর বহু দেশে আমি গিয়েছি। আল্লাহ আমাকে তাঁর জমিনের একটা বড় অংশ দেখার সুযোগ দিয়েছেন। দেখেছি, অঞ্চলভেদে মানুষের ভাষা ভিন্ন, জীবনাচার ভিন্ন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব মানুষ এক। সব মানুষের চাহিদা এক, হৃদয়ের ভাষা এক, একই রকম তার কল্যাণকামিতা। পৃথিবীর যে জায়গাতেই তার জন্ম আর বেড়ে-ওঠা হোক না কেন, সব মানুষের মধ্যেই আছে একটা অপূর্ব ঐক্য আর অভিন্ন ঐকতানের সুর।

কোয়ান্টামের প্রতি আমার যে একটা আকর্ষণ, তার মূল কারণও এটাই– গুরুজী তার আলোচনায় কোরআনে যে শাশ্বত সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে, তা তুলে ধরেছেন, সততা আর চিরায়ত মূল্যবোধের কথা বলেছেন। মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও ভালবাসার কথা বলেছেন। এর মধ্য দিয়ে একটি উন্নত মানসিকতার পরিচয় আমি কোয়ান্টামে খুঁজে পাই।

আর, কোরআনে বার বার বলা হয়েছে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি নজর দিতে। বলা হয়েছে ভেবে দেখতে, চিন্তা করতে। কিন্তু বিশ্বচরাচরের কোলাহলের মধ্যে এ নজর দেয়া সম্ভব হয় না, এর জন্যে চাই তাফাক্কুর বা মেডিটেশন। আত্ম উদঘাটনের জন্যেও প্রয়োজন মেডিটেশনের এই নীরবতা।

জীবন একটাই। এই এক জীবনে যতটা সম্ভব কাজ করে যেতে হবে আমাদের। মানুষকে ভালবাসা আর স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাধ্যমতো সুযোগও এই একটাই। নখ্শবন্দীয়া তরীকায় একটা কথা আছে–Hands on the work and heart on the Creator. অর্থাৎ হৃদয়টা প্রভুতে সমর্পিত করে নিরন্তর কাজ করে যাওয়া। কথাটা আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স শোকরান শোকরান ৩৫০ ব্যাচে (জুলাই ২০১২)
অংশগ্রহণ-পরবর্তী সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

কৃতজ্ঞচিত্ততাই কোয়ান্টামের মূল কথা

কোয়ান্টামে আমি এর আগেও অনেকবার এসেছি। গুরুজী আমাকে ভালবেসে ডেকেছেন, সেই সূত্রে নানা বিষয়ে বিভিন্ন সময় কথাও বলেছি। কিন্তু একসাথে চার দিন এতটা সময় বসে ওনার কথা শোনার সুযোগ হয় নি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের প্রথমদিনের আলোচনাতেই আলফা, বিটা, গামা ব্রেন-ওয়েভের কথা এসেছে। আমার সাবজেক্ট হলো ফিজিক্স। সেখানে আছে আলফা পার্টিকেল, বিটা পার্টিকেল, গামা পার্টিকেল আর তাদের ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আর এখানে এসে পেলাম এর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। দেশে ও বিদেশে গত ৪০ বছর ধরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়াই। তাই এখানে আলোচিত বিষয়গুলো আমার স্বাভাবিকভাবেই ভালো লেগেছে।

কিছুদিন আগে রোটারি ক্লাব চাঁদপুর-এর একটি অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। ওখানে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক কথা বললাম। পরের দিন স্টিমারে চড়ে ঢাকা ফিরছি। সফরসঙ্গী ছিলেন একজন সাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এবং তার স্ত্রী, যিনি একজন লেখিকা। আলাপের এক পর্যায়ে তারা বললেন, আপনি কি জানেন, যে কথাগুলো আপনি বলেন এগুলো আপনার কথা না। আমি হেসে বললাম, তাহলে কি আমি অন্য জায়গা থেকে চুরি করে এনে বলছি? তারা বললেন, কথাগুলো আপনাকে দিয়ে বলানো হয়। আমি বিষয়টা তখন ঠিক বুঝি নি কিংবা বিশ্বাস করি নি। আজকে আমি বিশ্বাস করি, গুরুজী যা বলছেন আর যে কাজ করছেন, এটা উনি একা করছেন না; বরং ওনাকে দিয়ে করানো হচ্ছে।

গুরুজী শুকরিয়ার কথা বলেছেন। This is the key word of the Universe. কোরআনে বলা হয়েছে, মানুষকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহর কী লাভ, যদি সে শোকরগোজারি করে ও ঈমান আনে? (৪:১৪৭)। শুধু এটা বুঝতে পারলেই জীবনের অনেক কিছু বোঝা সহজ হয়ে যায়। আমি দেখেছি, এই শোকরগোজারি অর্থাৎ কৃতজ্ঞচিত্ততাই কোয়ান্টামের মূল কথা।

আজকে সারা পৃথিবীতে মানুষ ছুটছে। নিজের দিকে তাকানোর সময় নেই কারো। এভাবে ছুটতে ছুটতে নিজেকেই হারিয়ে ফেলছে একসময়। গুরুজী নিজের দিকে তাকাতে বলেছেন। নিজের অন্তরের দিকে তাকাতে বলেছেন। আর এ সবই তিনি বলেছেন খুব সুন্দর ও প্রাসঙ্গিক হিউমারের মধ্য দিয়ে। এটা খুব দরকারি। হিউমার হচ্ছে স্পাইসেস অব লাইফ।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে কনজ্যুমারিজম-এর কথা বলা হয়েছে। সত্যিই আজকের সভ্যতার একটা সংকট হলো এই কনজ্যুমারিজম। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, কত কম জিনিস ব্যবহার করে আমরা বাঁচতে পারি। আমি আমার ছেলেকে তিনটি প্রশ্ন শিখিয়েছিলাম। কোনো জিনিস কেনার আগে আমরা এ প্রশ্ন তিনটি নিজেদের করতে পারি।

প্রথম প্রশ্নটা হলো, ডু ইউ নিড ইট? এটা কি তোমার দরকার? ভেতর থেকে উত্তর যদি আসে–'হাঁ, আমার দরকার', তবে দ্বিতীয় প্রশ্ন–ডু ইউ নিড ইট ভেরি ব্যাডলি? এটি কি নিতান্তই প্রয়োজন? এর উত্তরও যদি হয় 'হাঁ', তাহলে তৃতীয় প্রশ্ন–ক্যান ইউ নট ডু উইদাউট ইট? এটা ছাড়া কি তোমার চলবেই না? এর উত্তরও যদি 'হাঁ' হয়, তবে বুঝতে হবে যে, ওটা আসলেই প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করি, কোয়ান্টাম মেথড চর্চার মধ্য দিয়ে এসব বিষয় অনুসরণ করা অনেক সহজ হয়ে উঠতে পারে।

কোর্সের প্রথম দুদিন মনে হলো–যা করছি সব তো আমার জন্যে করছি, আমার ভালোর জন্যে করছি, এ সবকিছু করলে আমার ভালো হবে; কিন্তু অন্যের কল্যাণের কথা তো কিছু বলা হচ্ছে না। যে-ই না এটা ভাবলাম, তার কিছুক্ষণ পরেই দেখি, তিনি অন্যের কল্যাণের কথা, অন্যের কল্যাণচিন্তার কথা, অন্যকে নিরাময়ের উপায় নিয়ে বললেন। আসলে অন্যের কল্যাণে কাজ করা আর অন্যের কল্যাণ কামনা করাতেই তো আমাদের সুখ।

আমি লামার কোয়ান্টামম-এ গিয়েছিলাম। দেখেছি, অন্যের জন্যে কাজ করার আর অন্যকে ভালবাসার অনেক উদাহরণ। আর এটাই হচ্ছে কোরআনের কথা। আলোকিত মানুষ হয়ে ওঠার পথও সেটাই। গুরুজী তার আলোচনায় বার বার রসুলের কথা বলেছেন। রসুলের জীবন থেকে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়েছেন। রসুল সারাক্ষণ অন্যের কথা ভাবতেন।

কোয়ান্টাম মেথড চর্চার মাধ্যমে আমরা সবাই সবার কথা ভাবি, সবার কল্যাণের কথা ভাবি। সেই পথ ধরে আমাদের দেশটা একটা শান্তির স্থানে পরিণত হোক, এই কামনা করি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স শোকরান শোকরান ৩৫০-এর প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্য

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেবে জীবন

'মানুষ রাতের আকাশ দেখে বিস্মিত হয়, সমুদ্রের বিস্তৃতি দেখে অভিভূত হয়; কিন্তু সে জানে না, মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় সে নিজেই।' আমেরিকার বোস্টনে একবার একটি মিউজিয়ামে সেন্ট অগাস্টিনের এ কথাটি পড়ে মনে হয়েছিল, সত্যিই স্রষ্টা মানুষকে কী অসাধারণ করে সৃষ্টি করেছেন!

মানুষ আজ মস্তিষ্কের জোরে পাড়ি জমাচ্ছে মহাশূন্যের প্রান্তসীমায় জ্ঞানের সর্বশেষ ফ্রন্টিয়ার খুঁজতে। অথচ জ্ঞানের সেই শেষ ফ্রন্টিয়ার সে বহন করছে তার ঘাড়েরই ওপর, তার মস্তিষ্কে। মানুষ যদি তার মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা সম্পর্কে জানে, মনোদৈহিক সিস্টেমগুলোর কার্যপরিধি বুঝতে পারে এবং সেগুলোকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়, তাহলে সে অসাধারণ অগ্রগতি লাভ করতে পারে। কারণ যে দেহ-মন নিয়ে মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে তার শক্তি অপরিসীম। অফুরন্ত এর সম্ভাবনা।

তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারে, সব মানুষ কেন এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারছে না? মানুষের এ অক্ষমতাকে তুলনা করা যেতে পারে সেই লোকের সাথে, যার একটি বাদ্যযন্ত্র রয়েছে কিন্তু এর তারগুলো নিয়ে 'টুং-টাং' শব্দ করে খেলা ছাড়া সে আর কিছু করতে পারে না। অথচ আরেকজন তারগুলোতে আঙুল চালনার ফলে বাদ্যযন্ত্রটি থেকে বেরিয়ে এলো অপূর্ব এক সুরের ঝঙ্কার। যার বাদ্যযন্ত্র, সে ভাবল, হায়! সারাজীবন আমি শুধু বাদ্যযন্ত্রটি বয়েই বেড়ালাম। অথচ কত সুরেলাই না হতে পারে এ যন্ত্র! এ আক্ষেপ অনেকেরই। যন্ত্র বয়ে বেড়াচ্ছে সবাই, কিন্তু সে যন্ত্রে কোন তারে কীভাবে আঙুল চালালে কেমন সুর বেরোবে তা অনেকেরই জানা নেই।

মানুষের দেহ-মনও এমনি একটি যন্ত্র, একটি সিস্টেম। ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, একটি সিস্টেমের মধ্যে সমাবেশ ঘটেছে আরো অনেক সিস্টেমের। যেমন, মানুষের চোখ একটি সুন্দর ক্যামেরা। যে জিনিসের দিকে আমরা তাকাই তার উল্টো ছবি ধরা পড়ে চোখের রেটিনাতে।

অপটিক নার্ভ ব্রেনে একটি সিগন্যাল পাঠিয়ে এই উল্টো ছবি সোজা করার ব্যবস্থা করে। এ কাজটি কীভাবে হয় তা এখনো রহস্যাবৃত।

আমাদের দেহ একটি মেকানিক্যাল সিস্টেম। চারটি ভাল্‌ভের নিদ্রাহীন কাজের মধ্য দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ড নামক পাম্প থেকে সঞ্চালিত হচ্ছে সারা দেহে। কেউ যখন ২০/৩০ কেজি ওজনের জিনিস টেনে তোলে কিংবা তার চুল দিয়ে একটি গাড়ি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়, তখন শরীরের মেকানিক্যাল সিস্টেমের কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

শরীর একই সাথে একটা কেমিক্যাল সিস্টেমও বটে। আমরা যত উপাদেয় খাবার খাই না কেন, শরীরের খাবার কিন্তু গ্লুকোজ। আমরা যা খাই শরীর তা বিশেষ এনজাইমের সাহায্যে ভেঙে ফেলে। প্রোটিন থেকে যে এমাইনো এসিডগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো দিয়ে শরীর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শরীরের উপযোগী প্রোটিন ও অন্যান্য উপাদান তৈরি করে। মায়েরা খাবার খেলে তা থেকে শিশুর জন্যে মায়ের স্তনে দুধ তৈরি হয় যে প্রক্রিয়ায়, তা যে-কোনো কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিকেও হার মানায়।

মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে, নার্ভ সেল যে সিগন্যাল পাঠায়, তা মূলত একটি ইলেকট্রিক্যাল বা বৈদ্যুতিক পাল্‌স। আবার হার্টের ইসিজিতে যে জিনিসটি ওপরে-নিচে ওঠানামা করে, তা-ও একটি ইলেকট্রিক ভোল্টেজ। আবার শরীর একটি একস্‌টিক সিস্টেমও (শ্রুতিবিজ্ঞান)। যে পদ্ধতিতে শব্দ আমাদের কানের ভেতরে গিয়ে ড্রাম ও অন্যান্য অংশকে সক্রিয় করে শব্দ শোনার অনুভূতি সৃষ্টি করে, তা একটি জটিল গাণিতিক বিষয়।

আবার কোটি কোটি সৈনিক কোষ শরীরের বিভিন্ন অংশে আক্রমণকারী অণুজীবগুলোর (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাংগাস ইত্যাদি) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, ফলে শরীর কাজ করছে একটি আত্মরক্ষামূলক সিস্টেম হিসেবে। দেহের পুষ্টি বা ভিটামিনের অভাবে বা কোনো কারণে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে এ অণুজীবরা জয়ী হয়, আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। আর তখন প্রয়োজন হয় ওষুধের। কিন্তু নিরাময় করতে হয় শরীরকেই, ওষুধ শরীরের কোষগুলোকে শত্রু নিধন করার কাজে সাহায্য করে মাত্র।

সবশেষে বলতে হয় কম্পিউটার সিস্টেমের কথা। মানুষ তার দেহে যে কম্পিউটার সিস্টেম বহন করছে, তার তুলনা হয় না। দেহকে চালানোর জন্যে প্রয়োজনীয় কমান্ড বা আদেশ আসছে শরীরের কেন্দ্রীয় প্রসেসিং ইউনিট মস্তিষ্ক থেকে। তবে হিউম্যান কম্পিউটারের অভিনবত্ব অন্য জায়গায়–তা হলো ডিএনএ।

বংশগতির নীলনকশা হিসেবে পরিচিত এই জৈব মলিকিউল বা অণুর বিভিন্ন জিনের মাঝে অনেক তথ্য লুকিয়ে আছে। আর একটি ডিএনএ-এর মধ্যে এ ধরনের জিনের সংখ্যা লক্ষাধিক। আমাদের সব তৎপরতার জন্যে– যেমন, আমাদের চোখের রং কেমন হবে, বুদ্ধি কেমন হবে ইত্যাদির জন্যে এক বা একাধিক জিন দায়ী। আধুনিক কম্পিউটারের সাথে তফাত এখানেই যে, মানুষের জৈব কম্পিউটারকে বাইরে থেকে কোনো সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম দিতে হয় না। কখন কোন কাজ করতে হবে বা হবে না, সে নির্দেশ তার ভেতরেই প্রোথিত আছে। জৈব কম্পিউটারের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই।

অর্থাৎ মেকানিক্যাল সিস্টেম, অপটিক্যাল সিস্টেম, একস্‌টিক সিস্টেম, ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম, কেমিক্যাল সিস্টেম, ডিফেন্স সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার সিস্টেম নিয়ে মানবদেহ নিজেই এক মহা-সিস্টেম। এই সিস্টেমগুলোর কার্যক্রম কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। বরং চমৎকার এক ঐকতানে এগুলো কাজ করছে। আর এ সবগুলো কাজ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্যে যে জিনিসটির প্রয়োজন, তা হলো মন। অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রের অধিকারী হওয়াই যথেষ্ট নয়। একে সঠিকভাবে বাজাতে হবে।

আর কোন সুর এ যন্ত্রে বেজে উঠবে, তা বলে দেবে আমার মন। কারণ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারার ওপরই নির্ভর করে তা ধ্বংস করবে, না সৃষ্টি করবে। মেডিটেশন বা ধ্যান মূলত এই নিয়ন্ত্রণ এনে দেয়। মেডিটেশন দেহ ও মনের মধ্যে অনুরণন ঘটিয়ে মনোদৈহিক কার্যক্রমগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে সহায়তা করে। তখন একজন মানুষের পাইলট হয় সে নিজেই। সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি থাকে তার হাতেই।

ধ্যানস্থ মনের সাহায্যে বস্তুকে অতিক্রম করে, ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন বাস্তবতা নির্মাণের সাধনা প্রাচ্যের মানুষ বহুদিন ধরেই করে আসছে। এখন পাশ্চাত্যের কর্মব্যস্ত মানুষেরাও মেডিটেশনের দিকে ঝুঁকছে। কারণ সবসময় শুধু ছুটতে থাকলে মানুষ অনেক ডাকই শুনতে পায় না। সে তখন প্রকৃতির নৈঃশব্দকে অনুভব করতে পারে না, জীব ও জড় জগতে যে নিয়ম কাজ করছে তা উপলব্ধি করতে পারে না, নিজের ভেতরের ডাকও শুনতে পায় না। তখনই সে নিজেকে শুনতে পায় যখন সে শান্ত হয়, নিজের ভেতরে ডুব দেয়।

আর মেডিটেশন এই আত্মনিমগ্নতা সৃষ্টি করে। মেডিটেশনের মাধ্যমেই একজন মানুষ সংযোগ সাধন করতে পারে তার অন্তরের আমি-র সাথে। আত্মপরিচয় ও আত্ম উপলব্ধির এই পর্যায়ে মানুষের কর্তব্য হলো, এই

বিস্ময়কর সিস্টেম যাঁর কাছ থেকে এসেছে, তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা। সেইসাথে খুঁজে দেখা–কেন এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করে সৃষ্টি করে তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। আর কেনই-বা পৃথিবীতে তার সুন্দর স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্যে এত নেয়ামত দেয়া হয়েছে।

স্রষ্টা ভালবাসার মধ্য দিয়ে প্রতিটি সৃষ্টিকে তৈরি করেছেন। ভালবেসেই সৃষ্টিকে তিনি লালন করছেন। আর সকল সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি মানুষকে রেখেছেন, স্রষ্টার প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই মানুষের আসল কাজ হলো সৃষ্টিকে লালন, সৃষ্টির অভিভাবকত্ব গ্রহণ।

সেবার এ কাজটি আগে শুরু করতে হবে নিজ পরিবারে। আজকের বস্তুতান্ত্রিক সমাজে পারিবারিক বন্ধন আর সেই আগের মতো নেই। 'হাউজ' আছে কিন্তু 'হোম' হারিয়ে গেছে। সন্তানের ওপর বাবা-মার প্রভাব নেই; বরং সন্তান প্রভাবিত হচ্ছে তার বখে যাওয়া বন্ধুবান্ধব আর মিডিয়া প্রচারিত ধ্যানধারণা দিয়ে। অভিজাত এলাকার ক্লাব, হোটেলগুলোতে গেলে দেখা যাবে, ছেলে-মেয়েরা স্কাই-রুমে গিয়ে জন্মদিন পালন করছে। মা-বাবারাই হয়তো সেখানে যাওয়ার জন্যে তাদেরকে পয়সা দিচ্ছেন। এখনকার ছেলে-মেয়েদের হয়তো টাকাপয়সা, গাড়ি, দামি খেলনার কোনো অভাব নেই, অভাব শুধু একটু ভালবাসার, একটু স্নেহের।

পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক মমতা ও ভালবাসাই পারিবারিক শান্তির মূল ভিত্তি। আর এ-ক্ষেত্রে মা-বাবার প্রতি মমতা ও আনুগত্য হলো এক অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কিন্তু আজকে পরিবার থেকে অভিভাবকত্ব হারিয়ে গেছে। একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই কিন্তু ফেনসিডিল খেতে শুরু করে না, বখাটেপনা করে বেড়ায় না। বরং তার বেড়ে ওঠার ওপরই নির্ভর করে সে সুসন্তান হবে, না কুসন্তান হয়ে সমাজে ত্রাস সৃষ্টি করবে।

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, যে-সব শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে বেড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা, সহিংসতার মাত্রা অনেক কম। এর ফলে মায়ের সাথে তাদের যে শারীরিক, মানসিক, আত্মিক বন্ধন তৈরি হয়, তা তাদের সুস্থ বিকাশে সহায়ক।

সন্দেহ নেই, মা-বাবা সন্তানের আরাম-আয়েশের জন্যে টাকাপয়সা, বাড়ি-গাড়ির পেছনে ছুটছেন। ছুটতে গিয়ে পরিবারকে উপেক্ষা করায় একসময় তারা বুঝতে পারেন, পরিবারের অন্য সবার সাথে তার সম্পর্কের সমীকরণ ঠিক হচ্ছে না। অন্যরাও তাকে বুঝছে না, তিনিও অন্যদেরকে বুঝতে পারছেন না। তখন আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হয়।

তাই অনেক ব্যস্ততার পরও অন্তত একবেলা সবাই একসাথে বসে খাওয়া যেতে পারে। আসলে বাবা-মাকে সন্তানের বন্ধু হতে হবে। তাদের উচিত, সন্তানের ব্যাপারে সবসময় খোঁজখবর নেয়া। সন্তান যদি সুসন্তান হয়, তাহলে এর চেয়ে ভালো বিনিয়োগ আর নেই। এ সন্তানই তখন বাবা-মার জন্যে এনে দিতে পারে পরিতৃপ্তি, সম্মান, শান্তি সবকিছু।

স্রষ্টা যে ভালবাসার মধ্য দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে লালন করছেন; একইভাবে মানুষও তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে পারে। আসলে অন্যের প্রতি মমতা, ভালবাসা, অন্যকে লালন করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত। প্রতিটি প্রাণীই বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীর তফাত এখানেই যে, অন্য সব প্রাণী নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর মানুষ শুধু নিজের কথাই ভাবে না, ভাবে চারপাশের সবার কথা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-আবাসে থাকাকালীন প্রতিদিন ভোরে কাককে রুটি খাওয়াতাম। একদিন খেয়াল করলাম, একটি কাক ১০ বার এসে রুটি নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আরেকটি কাক–যে একটি টুকরোও পায় নি, তাকে নেয়ার সুযোগ দিচ্ছে না। মানুষ কিন্তু এর ব্যতিক্রম। নিজে খাওয়ার আগে সে পাশের জনকে জিজ্ঞেস করে, সে খেয়েছে কিনা। আসলে নেয়ার মধ্যে নয়, দেয়ার মধ্যেই রয়েছে সত্যিকারের প্রশান্তি ও আনন্দ।

আমার ছোটবেলার একটি ঘটনা। যশোর জিলা স্কুলে সবে ভর্তি হয়েছি। তখন স্কুল থেকে টিফিন দেয়া হতো। খাতায় নাম লেখা হয় নি বলে প্রথমদিন আমার টিফিন আসে নি। এদিকে ক্লাসের এক দুষ্টু ছেলে প্রতিদিন দুটো করে সিঙাড়া নিয়ে নিত। সেদিন স্যার ইচ্ছে করেই ক্লাস-ক্যাপ্টেনের পরিবর্তে সেই ছেলেটিকে টিফিন বিতরণের দায়িত্ব দিলেন। সবাইকে দেয়া শেষে ঝুড়ি নিয়ে যখন সে আমার কাছে এলো, তলানিতে তখন একটি মাত্র সিঙাড়া পড়ে ছিল। সে তখন সিঙাড়াটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'আমি তো রোজ খাই, আজকে তুই খা'।

সবাইকে ভাগ করে দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বলেই সেই দুরন্ত ছেলেটিও দেয়ার আনন্দকে উপভোগ করতে পেরেছিল। শিশুকে ছোটবেলা থেকে একটু একটু করে দায়িত্ব দিতে হবে। ঘরে সেবা দেয়ার অভ্যাস থেকে বড় দান করার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

দিনশেষে একজন মানুষের উচিত আত্মপর্যালোচনা করা। নিজেকে জিজ্ঞেস করা যে, সৃষ্টির অভিভাবক হিসেবে তাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা সে কতটুকু পালন করতে পেরেছে–আজ কজন লোককে সে দেখতে

পেরেছে। এ পদ্ধতি জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে নয়, বরং জীবনকে সহজ ও সুন্দর করার জন্যে। জীবন ধারণের জন্যে নিঃসন্দেহে বস্তুর প্রয়োজন। কিন্তু বস্তুই একজন মানুষের জীবনের সবকিছু নয়। এ-ক্ষেত্রে হযরত জালালউদ্দীন রুমীর চমৎকার একটি উপমা রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'নৌকা চলার জন্যে পানি অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু এই পানি যখন নৌকার ভেতরে প্রবেশ করে তখন নৌকাডুবি ঘটে।' অর্থ খ্যাতি বস্তুর পেছনে যখন কেউ মোহগ্রস্তের মতো ছোটে, তখনই তার আত্মিক মৃত্যু ঘটে।

আসলে যে মানুষ শুধু নিজের জন্যে বাঁচে, সে বেঁচে থেকেও যেমন শান্তি পায় না, তেমনি মৃত্যুর পরেও হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে। আর যে মানুষ অন্যের জন্যে বাঁচে, সৃষ্টির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে, সবসময় সে অমর হয়ে থাকে। গ্রহীতা নয়, দাতার নামই কালের পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকে। তাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্রষ্টার সশ্রদ্ধ স্মরণ এবং সার্বজনীন মমতা ও ভালবাসায় তাঁর সৃষ্টিকে লালন–এটিই হওয়া উচিত একজন মানুষের জীবনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

৭ জুন, ২০০৫-এ কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত ভাষণ

সুফিদের বিজ্ঞান ভাবনা

আপনারা সত্যিই ভাগ্যবান যে, কোয়ান্টামের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছেন। কোয়ান্টাম মেথডের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এখানকার প্রতিটি আলোচনায় শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে। তার চেয়েও বড় যে বিষয়, যে সাফল্য–আমি বিশ্বাস করি, সেটি আপনারা পেয়েছেন এবং এখনো পাচ্ছেন।

সেটা হলো, অন্তরের ধ্বনি শুনতে পাওয়া কিংবা সে ধ্বনি শোনার চেষ্টা করা। আমাদের সবার অন্তরেই এ ধ্বনি আছে। কিন্তু আজকের ব্যস্ত পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই ওঠ্ ওঠ্ ওঠ্, ছোট্ ছোট্ ছোট্, দৌড় দৌড় দৌড় করতে করতে আর নিজের সঙ্গে কথা বলতে পারে না, কথা বলার ফুরসত পায় না। শুনতে পায় না নিজের অন্তরের ধ্বনি। এ কাজটি যে আপনারা এখানে এসে করতে পারছেন, এ এক অপূর্ব পাওয়া।

আজকে আমি একটা নতুন বিষয় নিয়ে বলব। আশা করি আপনারা এটি পছন্দও করবেন। এটি মূলত আমার লেখা একটি নিবন্ধ। যার বিষয় হলো, *সায়েন্স এন্ড দা থট্‌স অব সুফি'স*। বাংলায় বলতে পারি, সুফিদের বিজ্ঞান ভাবনা। সুফিরা যে জগতে ডুবে থাকেন এবং স্রষ্টার সাথে তাদের যেভাবে যোগাযোগ হয়, তার মাধ্যমে তারা সত্যে উপনীত হন। আর আমরা বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নানান রকম যাচাই-বাছাই করে, এখানে-ওখানে, লন্ডনে, দিল্লিতে, মস্কোতে একই জিনিস পরখ করে তারপর একটা সত্যে উপনীত হই।

অবাক হওয়ার মতোই ব্যাপার যে, বহুক্ষেত্রে আমরা বিজ্ঞানীরা যে-সত্যে উপনীত হই, সুফিরা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে সেই একই সত্যে উপনীত হন। এ বিষয়ে অনেকগুলো উদাহরণ আমি আজ আপনাদের বলব এবং অত্যন্ত সহজ করে বলার চেষ্টা করব। একটা আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলনে এ নিবন্ধটি আমি পাঠ করেছিলাম।

যে-কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্যে সায়েন্সের একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। কিন্তু তারপরও এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমরা সকল সত্যে উপনীত

হতে পারি না, অনেক সত্যে উপনীত হতে পারি। এই বিজ্ঞান বা সায়েন্সের পথ এবং সুফিজমের পথ কিন্তু আলাদা, এক নয়। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো বিষয়ে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান আর একই বিষয়ে সুফিদের এবং তাদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত কবি ও দার্শনিকদের চিন্তা-চেতনাও অনেক ক্ষেত্রে একই উপসংহারে এসে পৌঁছায়।

শেখ সাদী (র)-এর জীবন দেখুন। আমরা মিলাদ পড়ি, ওখানে আবৃত্তি করি, *বালাগাল উলা বে-কামালিহী, কাশাফাদ্দুজা বে-জামালিহী, হাসনাত জামিও খেছালিহী*–তারপরে তিনি আর মেলাতে পারছিলেন না, কিছু আসছিল না তার মাথায়। খেই হারিয়ে ফেললেন। একসময় স্বপ্নে আদিষ্ট হলেন যে, বলো, সাল্লু আলাইহে ওয়ালিহী। এই বাক্যের চেয়ে ভালো মিল আর হয় না। শেখ সাদী-কে নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সাদী লিখেছেন–*বার্গে দারাখতানে সবজ্/ দার নাজারে হোঁশিয়ার/ হার ওরাকে দাফতারিসত/ মারেফাতে কারদেগার*। শব্দগুলো ফার্সি। আপনারা জানেন, মোঘলরা যখন এখানে এসেছিল তখন উপমহাদেশের রাষ্ট্রভাষা ছিল ফার্সি। তাই তখন অনেক বাড়িতে, এমনকি রবীন্দ্রনাথের বাড়িতেও ফার্সি ভাষার চর্চা হতো, মাইকেল মধুসূদনও ফার্সি শিখেছিলেন। পরে ইংরেজরা এসে অবশ্য এটা বদলে দেয়।

যা-ই হোক, এই শব্দগুলোর বাংলা করলে দাঁড়ায়–দারাখতানে সবজ্ মানে সবুজ গাছ, হোঁশিয়ার মানে সচেতন, নজর মানে দৃষ্টি, ওরাক মানে পাতা, দফতর মানে দলিল বা নথিপত্র আর মারেফাত হলো জ্ঞানের একটি ধারা, কারদেগার মানে কারিগর বা স্রষ্টা। এর অর্থ করলে দাঁড়ায়–একজন সচেতন ব্যক্তির দৃষ্টি যদি সবুজ গাছের পাতায় পড়ে, তাহলে সে সেই পাতার মধ্যে দেখতে পাবে তার কারিগরের গুপ্তধনের দলিল অর্থাৎ জ্ঞান।

একথা যখন উনি লিখেছিলেন তখন কিন্তু ফটোসিন্থেসিস বা সালোক-সংশ্লেষণ কী, বিজ্ঞানীদের তা জানা ছিল না। কিন্তু আজকে আমরা জানি, একটা গাছ মাটি থেকে কিছু রস আর পানি নিয়ে, বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সালোক-সংশ্লেষণ করে নিজের খাদ্য তৈরি করে। তার নিজের প্রয়োজনে সামান্য একটু অংশ রেখে বাকিটুকু সে ধরে রাখে মানবজাতির জন্যে।

রবীন্দ্রনাথও একই কথা বলেছেন তার *বৃক্ষ বন্দনা* কবিতায়। *শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই/ যে তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান/ করেছ জগৎজয়ী; দিলে তারে পরম সম্মান*। রবীন্দ্রনাথ সালোক-

সংশ্লেষণের বিষয়টিকে তার ভাষায় লিখলেন 'দিনধেনু'। অর্থাৎ দিনকে তিনি একটা গাভীর সঙ্গে তুলনা করলেন। আর বললেন, তুমি বৃক্ষ, ওই গাভীর মতো দিনটাকে দুইয়ে নিচ্ছ, দুইয়ে নিয়ে যে তেজে ভরিলে মজ্জা, ওখান থেকে একটা শক্তি আসছে। এখান থেকেই তো, এগুলো আবার চাপা পড়লে কয়লা হয়। আবার প্ল্যাংকটন চাপা পড়লে তেল হয়।

এই যে তেল কয়লা কাঠ, যা-কিছু আছে, আমাদের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান-সব আসে এই উদ্ভিদ থেকে। এবং উদ্ভিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হলো পাতার সবুজ অংশ ক্লোরোফিল। শেখ সাদী বলেছেন, সেই পাতার মধ্যে নিহিত আছে সমস্ত রহস্য। যদিও আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম মেকানিক্স অব ফটোসিনথেসিস সম্পর্কে পুরোপুরি জানতে পারেন নি। তারা এখনো উদ্ধার করতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন যে, কীভাবে বৃক্ষ এ কাজটা করে। এরপরও বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যেটুকু জানতে পারলেন, শেখ সাদী কীভাবে তারও আগে সেই সত্য বলে গেলেন, সেটা ভাবতে অবাক লাগে।

ওমর খৈয়ামের প্রসঙ্গে আসি। পাশ্চাত্যের ধারণা অনুসারে, ওমর খৈয়াম হচ্ছেন মদভর্তি গ্লাস হাতে একজন মাতাল। কিন্তু ওমর খৈয়াম যে সুরা-র কথা বলেছেন, তা এই সুরা নয়। তিনি যে ভালবাসার কথা বলেছেন, যে আসক্তির কথা বলেছেন, সেটা অন্য আসক্তি। ইন্দ্রিয়-আসক্তি নয়।

তিনি ছিলেন একজন বড় গণিতজ্ঞ। এবং তাকে বলা হয় 'ফাদার অব দা কিউবিক ইকুয়েশন'। একজন গণিতজ্ঞ হিসেবে কয়েক বছর আগে ইউনেস্কো তার জন্মদিন পালন করল। আমাদের জাতীয় কবি নজরুল লিখেছিলেন– *মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই,/ যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই*। ঠিক সে-রকম ওমর খৈয়াম চাইতেন, তিনি যেন সেজদারত অবস্থায় মারা যান। এবং তা-ই হয়েছিল। তার আরেকটা ইচ্ছা ছিল, এমন একটা গাছের তলায় যেন তাকে সমাধিস্থ করা হয়, যেখানে গাছের পাতাগুলো পড়ে তার কবরটা সবসময় পাতায় আচ্ছন্ন থাকবে।

আজ থেকে ২৫ বছর আগে যখন প্রথম ইরানের নিশাপুর সফরে যাই, অবাক হয়ে গেলাম–ঠিক যেভাবে তিনি কল্পনা করেছেন, গাছের নিচে যেভাবে তাকে শুইয়ে রাখার ইচ্ছা করেছিলেন, ওমর খৈয়াম ঠিক সেভাবে শায়িত আছেন ওখানে। এটা ছিল এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি থেকে উদ্ভূত একটি আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্রনাথও সে সমাধিস্থল দেখতে এসেছিলেন।

খৈয়াম লিখেছেন, *The Moving finger writes, and having writ,/ Moves on : not all your piety nor wit/ shall write it back to*

cancel half a line/ nor all your tears wash out a word of it (Rubaiyat). পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, সাত সাগর যদি কালি হয় এবং পৃথিবীর সকল গাছ যদি কলমে রূপান্তরিত হয়, তবু স্রষ্টার কথা লিখে শেষ করা যাবে না। ওমর খৈয়াম রুবাইয়াৎ-এ বলছেন, যতই কাঁদো, এর একটি অক্ষরও তোমার চোখের পানিতে মুছে যাবে না, পরিবর্তন হবে না।

বিজ্ঞানীরা এই কথাটিই বললেন এনট্রপি ইন থার্মোডায়ানামিকস-এ। একজন সুফির অন্তর্দৃষ্টি থেকে তিনি যা বলেছিলেন রুবাইয়াৎ-এ, বিজ্ঞানীরা ১৯৭৮ সালে এসে বললেন যে, এটা থার্মোডায়ানামিক প্রিন্সিপল-এর সাথে দারুণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে যে কথাটি বলতে চাচ্ছি সেটি হলো, ওমর খৈয়ামকে বিজ্ঞানীরা উদ্ধৃত করছেন।

এবারে আসি হাতিফ ইস্পাহানী-র প্রসঙ্গে। তিনি ছিলেন হিজরি ১১ শতকের একজন সুফিসাধক। তার ওপর বই খুঁজতে গিয়ে আমি তেহরানের অনেক লাইব্রেরি চষে ফেলেছি, অনেক অপেক্ষার পর বইটি এক জায়গায় পেয়ে যাই। তিনি লিখেছেন, *দেলে হার জাররাই কেহ্ বেশকাফি আফতাবিশ দারমিয়ান বিনি*। 'দেলে' মানে দিল, 'হার' মানে প্রত্যেক বা আমরা যে হরহামেশা বলি, তা। 'জাররা' মানে খুব ছোট্ট, আর 'আফতাব' হলো সূর্য। অর্থাৎ যদি তুমি প্রতিটি ক্ষুদ্র বস্তুর গভীরে প্রবেশ করো এবং আঘাত করো, তাহলে তার কেন্দ্রবিন্দুতে একটা সূর্য দেখতে পাবে।

কী অদ্ভুত কথা! এখন আমরা জানি যে, যে-কোনো বস্তু বা পদার্থের এটমের ভেতরে আছে নিউক্লিয়াস, বাইরে ইলেক্ট্রনগুলো। সৌরজগতের গ্রহগুলো যে-রকম সূর্যের চারপাশে ঘুরছে, প্রতিটি এটমের মধ্যে ইলেক্ট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরছে। আর ওই নিউক্লিয়াসের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে সমস্ত শক্তি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক হামলার মধ্য দিয়ে যে জঘন্য হত্যাযজ্ঞ হলো, তার মূল পরিকল্পনায় ছিলেন রবার্ট ওপেনহাইমার। তিনি খুব বড়মাপের বিজ্ঞানী ছিলেন। ১৯৬৭ সালে আমি যখন ইতালির ট্রিয়েস্টে-তে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স-এ পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করছিলাম, তখন খুব অল্প বয়সে আমাকে ওখানকার এসোসিয়েট মেম্বার করা হয়। এর ফলে একবছর অন্তর অন্তর তিন মাসের জন্যে আমার ওখানে গিয়ে কাজ আর গবেষণা করার সুযোগ মেলে। যে কমিটির মাধ্যমে আমাকে ওখানকার এসোসিয়েট মেম্বার নির্বাচন করেছিলেন, সেই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন রবার্ট ওপেনহাইমার।

যা-ই হোক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কেউ তাকে নাকি আর হাসতে দেখে নি। কারণ তিনি নিজেও বুঝতে পারেন নি যে, হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে যে এটম বোমাগুলো ফেলা হচ্ছিল, সেগুলোর ধ্বংসক্ষমতা এতটা হবে।

আমেরিকা মনে করেছিল, জার্মানরা এগিয়ে যাচ্ছে। এজন্যে এটম বোমার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করছিল। তাই বোমা ফেলার আগে এ নিয়ে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করা হয় নি। এ-ক্ষেত্রে যে ঘটনাটি ঘটে তা হলো, একটা নিউট্রন গিয়ে ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসে আঘাত করে। ওটা ভেঙে দুটো অংশ হয়, কয়েকটা নিউট্রন বের হয়। তারপর একটা নিউট্রন আবার আরেকটা নিউক্লিয়াসে গিয়ে আঘাত করে, আবার দুটো অংশ হয়। আবারো দু-তিনটি নিউট্রন বেরিয়ে আসে। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফিশন (Fission)। এভাবে প্রতিটি ফিশন হওয়ার পর এক প্রচণ্ড শক্তি তৈরি হয়–প্রায় দু শ মিলিয়ন ইলেক্ট্রিক ভোল্ট। এ যে কী পরিমাণ শক্তি, সেটা বোঝাতে গিয়ে পরমাণুবিজ্ঞানী রবার্ট জুঙ্ক একটি বই লিখেছেন–*ব্রাইটার দ্যান অ্যা থাউজেন্ড সান্‌স*। এ থেকে বোঝা যায় যে, পদার্থের ভেতরের শক্তিটা কী বিরাট শক্তি হতে পারে! বইটা পরে বাংলা একাডেমী থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

এখন চিন্তা করুন, এ বিষয়গুলো বিজ্ঞানেরও বুঝে ওঠার কয়েক শ বছর আগেই হাতিফ ইস্পাহানি কী করে বললেন যে, প্রত্যেকটা বস্তুর ভেতরে যদি তুমি আঘাত করো, তবে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে একটা সূর্য! হিজরি ১১ শতকে অণু-পরমাণুর কোনো ধারণাই মানুষের ছিল না। ১৯১২ সালের আগে নিউক্লিয়াসের মধ্যে কী আছে, সেটিও বোঝা যায় নি। অথচ কী নিখাদ কথা তিনি বলে গেলেন! পরবর্তীতে গবেষণায় আমরা তা দেখতে পেলাম। এজন্যেই আমি লিখেছি, Compare this with the release of fission energy from the nucleus of the uranium atom. Most of the energy of an atom is locked up in its nucleus which may be considered as the heart of the atom.

এরপরে দেখুন মওলানা রুমী-র ধ্যানের পদ্ধতি, যেখানে বিশেষ উপায়ে ঘুরে ঘুরে দরবেশরা নৃত্য পরিবেশন করেন। রুমী-র কবিতা পাশ্চাত্যে তরুণদের মাঝে বেশ জনপ্রিয়। কারণ তার কবিতায় রোমান্টিসিজম যেমন আছে, তেমনি আছে গভীর আধ্যাত্মিকতা। এক গভীর ভাব রয়েছে তার কবিতার মধ্যে। একেকজন ঘূর্ণায়মান দরবেশ নেচে নেচে সামা পরিবেশন করার সময় তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকে বাদ্যযন্ত্র। তুরস্ক, তাজিকিস্তানে গেলে এদের দেখতে পাওয়া যায়। আমি ওখানে তাদের দেখেছি।

এ দরবেশরা নৃত্যের তালে তালে যেভাবে ঘোরেন, তা দেখলে মনে পড়ে যাবে পৃথিবীর ঘূর্ণনের কথা। অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যের চারদিকে যেভাবে এন্টিক্লক-ওয়াইজ (ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে) ঘোরে, তারাও সেভাবে বাম থেকে ডানে ঘোরেন। হজের সময় হাজরে আসওয়াদকে হাতের বাঁয়ে রেখেও আমরা কিন্তু এন্টিক্লক-ওয়াইজ ঘুরি।

ক্লক-ওয়াইজ ঘুরলে কী হতো? এন্টিক্লক-ওয়াইজ কেন ঘুরছি? আমরা কি এটা ভেবে দেখেছি কখনো? আমি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলেছেন, তারা ভেবে দেখেন নি। আমরা এন্টিক্লক-ওয়াইজ ঘুরছি প্রকৃতির ছন্দে নিজেকে ছন্দায়িত করার জন্যে। কারণ যে গ্রহে আমাদের বসবাস, সেই গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যের চারপাশে এন্টিক্লক-ওয়াইজ ঘুরছে। ইসলাম ফিতরাত বা প্রকৃতির ধর্ম। আর আমাদের সকল হিসাবনিকাশ এই পৃথিবীকে ঘিরে। যেমন ধরুন, সময়। পৃথিবী তার নিজস্ব কক্ষপথের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। আর সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসতে লাগে ৩৬৫ দিন। তাহলে আমার সময়–আমি যে গ্রহে বাস করি, সে গ্রহের ঘূর্ণনের সঙ্গে সংযুক্ত; সেভাবেই আমাদের সময়টা নির্ণয় করি। আবার আমরা কোনো জিনিসের দৈর্ঘ্য মাপি–এক মিটার বা দুই মিটার–সে দৈর্ঘ্যটাও পৃথিবীর ২৫ হাজার মাইল দৈর্ঘ্যের একটা অংশমাত্র। এছাড়াও আমরা যে ভর দেখি–কোনো জিনিস কত ভারী তার ওজন মাপি, সেটাও পৃথিবীর সমস্ত ভরের একটা ক্ষুদ্র অংশ। অর্থাৎ মৌলিক বিষয় হলো ভর, দৈর্ঘ্য এবং সময়। এ তিনটি দিয়ে পৃথিবীর সবকিছু বিবেচনা করা যায়। অর্থাৎ যে পৃথিবীতে, যে প্রকৃতিতে আমরা বাস করি, আমরা এর বাইরের নই। এর সাথে খাপ খাইয়েই আমাদের চলতে হবে। এটাই প্রকৃতিসম্মত এবং ইসলামসম্মত।

যে কারণে কোরআনে সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন-রাত্রির আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। তারা দাঁড়িয়ে, বসে বা শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য নিয়ে ধ্যানে নিমগ্ন হয় এবং বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করো নি'। দেখা যায়, একেকটি ঋতুতে যে জায়গায় যে জিনিস পাওয়া যায়, সার্বিকভাবে সেখানকার মানুষের ভালোর জন্যেই এর ফলন হয়।

যেমন, এখন গবেষকরা দেখছেন, মার্চ-এপ্রিল মাসে ঋতু পরিবর্তনের সময় যে চিকেন-পক্সের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, সজনে ডাঁটার মধ্যে আছে তার প্রতিষেধক। শুধু তা-ই নয়, যে দেশে যে ফল হয় কিংবা যে মাছ থাকে, তা

সেই এলাকার মানুষের জন্যেই সবচেয়ে বেশি উপকারী। অন্য এলাকার বা দেশের জন্যে সেটার প্রয়োজন অতটা বেশি নয়।

আমাদের দেশে একটা সময় আফ্রিকান মাগুর আমদানি হলো, চাষ করা হলো। কিন্তু পরে বোঝা গেল যে, দেশি মাগুর মাছই আমাদের জন্যে ভালো ছিল। এছাড়াও আমাদের দেশে কতরকম ফল হয়–আম জাম কাঁঠাল কলা পেয়ারা আতা আনারস মেওয়া সফেদা পানিফল কুঁচফল আরো কত কী। ডালিম এ মাটিতে হয় বলেই-না কবি লিখেছেন, *এইখানে তোর দাদির কবর, ডালিম-গাছের তলে..*। সে-সব গাছ এখন গেল কোথায়? এত ফল থাকতে ওষুধ মেশানো আপেল কমলা আঙুর কেন আমদানি করতে হবে, আমি তা বুঝি না। যদি মনে করা হয় যে, জনসংখ্যা বাড়ছে, কীভাবে খাদ্যের সংস্থান হবে? তাহলে এখানে এই মাটিতে যা সহজে ফলে, তা-ই বেশি করে উৎপাদন করি না কেন আমরা? কেননা আমার সুস্থতার জন্যে আমার চারপাশে যখন যা পাওয়া যায়, সেটাই সবচেয়ে উপকারী। পৃথিবীর যে অংশে আমি বাস করছি, সেখানকার মধুটাই আমার জন্যে উপযুক্ত। অস্ট্রেলিয়ান মধু খাওয়ার আমার দরকার নেই। কারণ অস্ট্রেলিয়ান ফুল আলাদা, ওখানকার ব্যাধিও আলাদা। বুঝি না বলেই এ জাতীয় ভুলগুলো আমরা করি। প্রকৃতি একেকটা জায়গার প্রয়োজন বুঝে সেখানে সেই জিনিসগুলো সেভাবে দিয়েছে। আর এটা অনুসরণের মধ্যেই কল্যাণ। যে-কারণে কাবা শরীফে আমাদের ঘূর্ণনের দিক আর দরবেশদের ঘূর্ণনের দিক নির্ধারিত হচ্ছে পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। এটা একটা ন্যাচারাল অর্ডার।

রুমী-র একটি কবিতা আছে–*An Egypt that does not exist*। তাতে এক জায়গায় বলা হয়েছে, *The prophet said, there are some who see me by the same light in which I'm seeing them*. অর্থাৎ যে আলোতে আমি অন্যকে দেখি, সেই আলোতেই অন্যেরা আমাকে দেখতে পারে। এ নিয়ে খুব মজার একটি ঘটনা আছে এ কবিতার মধ্যেই।

একবার চীনা এবং গ্রিকদের মধ্যে তর্কযুদ্ধ হচ্ছিল কারা ভালো আর্টিস্ট তা নিয়ে। চীনারা দাবি করছে তারা ভালো, আবার গ্রিকরা দাবি করছে তারা ভালো। শেষমেশ বিষয়টা রাজদরবার পর্যন্ত গড়াল। চীনা ও গ্রিক দু-দলই গেল রাজার কাছে। চাইনিজরা যখন নিজেদের আর্ট সম্বন্ধে বলছিল, তখন গ্রিকরা একেবারে চুপ। একটাও কথা বলছে না। একপর্যায়ে চাইনিজরা রাজাকে অনুরোধ করল যে, আমাদেরকে দুটো রুম দিন, আর অনেক রং দিন, সেখানে আমরা আঁকব। তাহলেই আপনি দেখতে পাবেন কাদেরটা

সেরা–আর্টিস্ট হিসেবে আমরা ভালো, নাকি ওরা। রাজা তা-ই করলেন। মুখোমুখি দুটো রুম তাদের দেয়া হলো। দুটো রুমের মাঝ বরাবর টানিয়ে দেয়া হলো একটা পর্দা, যাতে এরা না দেখে ওরা কী করছে আর ওরা না দেখে এরা কী করছে।

চাইনিজরা খুব যত্ন করে নানান রং দিয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে দেয়ালে আঁকছে। নিজেদের আঁকা দেয়ালচিত্র দেখে তারা নিজেরাই মুগ্ধ। ওদিকে গ্রিকরা কিন্তু আঁকছে না। শুধু তাদের দেয়াল ঘষামাজা করছে। কী ব্যাপার! শেষ দিনে এসে চাইনিজরা যখন দেয়ালে তুলির শেষ আঁচড় দিল, ড্রাম বাজিয়ে হইহই রইরই কাণ্ড। চাইনিজরা খুব খুশি, কারণ তারা মনে করছে–দারুণ একটা কাজ হয়েছে। রাজাও দেখে মুগ্ধ হলেন–এত সুন্দর রং, এত নিখুঁত কাজ তোমরা করেছ! এই মুগ্ধতা নিয়ে এরপর রাজা গেলেন গ্রিকদের কাছে। কিন্তু গ্রিকরা তো কিছুই করে নি। খালি তাদের দেয়াল পলিশ করেছে। একপর্যায়ে দুই রুমের মাঝের পর্দাটা যখন তুলে ফেলা হলো, দেখা গেল, চাইনিজদের দেয়ালে যা আছে, তা গ্রিকদের দেয়ালেও আছে। কেন? কারণ গ্রিকরা তাদের দেয়াল এত ঝকঝকে করে পরিষ্কার করেছে যে, চাইনিজদের দেয়ালের ছবির প্রতিচ্ছবি গ্রিকদের দেয়ালে গিয়ে পড়েছে। অর্থাৎ মিরর রিফ্লেকশন হয়েছে। তারা মিরর রিফ্লেকশনের পদ্ধতিটাই সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছে।

এই ঘটনার সূত্র ধরে রুমী বলছেন, আত্মা যদি শুদ্ধ হয়, হৃদয় যদি ঝকঝকে আর পরিষ্কার হয়, একটি স্বচ্ছ কাচের আয়নার মতো হয়, তাহলে সেখানে মেসেজ আসবে। এ মেসেজ আসতে পারে যে-কোনো জায়গা থেকে–তারা থেকে, সূর্য থেকে, এমনকি শূন্য থেকেও। আমরা বলতে পারি, আমাদের নতুন নতুন মেসেজ পাওয়ার জন্যে চাই একটি বিশুদ্ধ অন্তর।

সকল সুফিদের সুফি, সকল সাধকদের সাধক, সকল পীরের বড় পীর হিসেবে আমরা হযরত সৈয়দ শেখ আবদুল কাদের জিলানী (র)-কে গণ্য করি। আপনারা হয়তো তার ফতহুল গায়েব পড়েছেন। ফতহুল গায়েবের অনেকগুলো বাণীর মধ্যে একটি বাণী যেদিন প্রথম পড়লাম তখন আমার কাছে মনে হলো, এর চেয়ে বড় সায়েন্টিফিক প্রিন্সিপল আর কী হতে পারে! তিনি সেখানে বলছেন, আমরা একজন বিচারককে চিনি কীভাবে? তার বিচারপ্রক্রিয়া দেখে। যেমন, আমরা কেউই হযরত সোলায়মান (আ)-কে দেখি নি। কিন্তু তার বিচার সম্পর্কে শুনেছি। এবং তিনি বিচারক হিসেবে যে কত বিজ্ঞ ছিলেন, তা আমরা বুঝতে পারি একটি ঘটনা থেকে।

ঘটনাটি হচ্ছে, দুই মা কাড়াকাড়ি করছে একটা ছেলেকে নিয়ে। এক মা বলছে, এটা আমার ছেলে; আরেক মা বলছে, আমার ছেলে। ছেলের দাবি নিয়ে দুজনের বিবাদ দেখে তিনি বললেন, ঠিক আছে, তোমরা দুজনেই যেহেতু মা বলে দাবি করছ–তাহলে এই ছেলেকে সমান দুই ভাগ করে তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। এটা শুনে সত্যিকার মা যিনি, তিনি বললেন, থাক দরকার নেই। আমি ওর মাতৃত্ব দাবি করছি না। ওই মহিলার কাছেই ছেলেকে দিয়ে দিন। তখন হযরত সোলায়মান বুঝে গেলেন–কে আসল মা। কত বিজ্ঞ ছিলেন তিনি!

একইভাবে আমরা একজন শিল্পীকে চিনি কীভাবে? তার শিল্পকর্ম দেখে। তিনি কোন রং কীভাবে ব্যবহার করেছেন, কতভাবে কারুকাজ করেছেন, সেটা দেখে আমরা বলি যে, তিনি কোন পর্যায়ের শিল্পী। যখন ইট-বালু-সিমেন্ট দিয়ে, তার সাথে সিরামিক্সের কারুকাজ করে কোনো স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়, সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি–কারিগর বা আর্কিটেক্ট কোন দরের। যেমন, তাজমহল। সিমেট্রি স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকে নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত চমৎকার। যে তুর্কি স্থাপত্যবিদ এর ডিজাইন করেছেন, তার সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা করতে পারি তাজমহল দেখে।

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) বলছেন যে, আমরা যে-রকম বিচার দেখে বিচারককে চিনি, কারুকার্য দেখে কারিগরকে চিনি, ঠিক একইভাবে সৃষ্টির যা-কিছু আছে, তা দেখে স্রষ্টাকে চিনতে হবে। তাই একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উচিত প্রথমে নিজের দিকে তাকানো, নিজের দিকে মানে নিজের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে তাকানো। সেগুলোর বিন্যাসকে বোঝার চেষ্টা করা। তারপর তাকে তাকাতে হবে অন্যান্য সৃষ্টির দিকে। তাহলেই সে স্রষ্টার দলিলকে বুঝতে পারবে। স্রষ্টাকে বুঝতে পারবে। যে-রকম একজন স্থপতির দলিল হচ্ছে তার নির্মিত স্থাপত্যকর্ম, একজন বিচারকের দলিল হচ্ছে তার রায় এবং যে প্রক্রিয়ায় সে রায়টি নির্ধারিত হয়, তেমনি স্রষ্টার দলিল হচ্ছে তাঁর সকল সৃষ্টি।

এই সৃষ্টিকে বুঝতে পারলেই, সৃষ্টিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পারলেই স্রষ্টাকে বোঝা যাবে। যে কারণে কোরআনে বলা হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যা-কিছু আছে, তার প্রতিটি জিনিসের দিকে তাকাও।' বার বার নজর দিতে বলা হয়েছে। বিজ্ঞানও একই সুরে বলে, মহাবিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটি রয়েছে তাকে যেমন পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তেমনি সবচেয়ে ক্ষুদ্র যে জিনিসটি রয়েছে, তার দিকেও দৃষ্টিপাত

করতে হবে। বিজ্ঞানীদের কাজের এজেন্ডা তো এটাই। তাই বলা হয়, বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই।

আমরা যে বলি 'আয়াত', এর মানে হলো নিদর্শন। কোরআনের সব আয়াতগুলোর যদি একটা সারমর্ম করেন, তবে দেখবেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই আয়াতগুলো হলো বিজ্ঞানসংক্রান্ত। এখানে যে নিদর্শনগুলোর কথা বলা হয়েছে, সেগুলো কিন্তু বিজ্ঞান। এখন বিজ্ঞানের জগতে পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাটির সম্বন্ধে জানার প্রয়াস চলছে। আর যে জিনিস যত ছোট তাকে জানার জন্যে আয়োজনটা তত বড়। একটি হাতিকে দেখতে হলে আমার কিছুই করতে হয় না, সাধারণ আলোয় আমি দেখতে পারি; কিন্তু একটা ইলেকট্রনকে দেখতে হলে গামা-রে দিয়ে যন্ত্রের সাহয্যে দেখতে হয়।

আসলে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) যে দলিলটি পড়তে বলছেন, আমরা সাধারণ মানুষেরা সেটা পড়তে পারি না কেন? কারণ এই দলিলের ভাষাটা হচ্ছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান দিয়ে এই দলিলকে পড়তে হবে। অনেক তরুণ আছে, বিজ্ঞান সম্পর্কে এক-আধটু জেনেই প্রশ্ন করে বসে, বিজ্ঞান দিয়ে তো সবকিছুই ব্যাখ্যা করা যায়; কিন্তু গড কে, তিনি কোথায় থাকেন, তাকে তো দেখি না। অথচ বড়পীরের কথার মধ্যেই তাদের এ প্রশ্নের উত্তর আছে যে, সৃষ্টির মধ্য দিয়েই স্রষ্টাকে পাওয়া যায়।

এই যে পৃথিবী সৃষ্টির শুরুতে এক মহাবিস্ফোরণ হলো, বিজ্ঞানীরা যাকে বলছেন বিগ ব্যাং, এর ইঙ্গিত কোরআনে আছে। আল্লাহ বলছেন, 'আকাশ এবং পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে একসঙ্গে ছিল, আমি একটা বিরাট বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে তা আলাদা করে দিলাম। পানি থেকে সবাইকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তোমরা বিশ্বাস করবে না?' আল্লাহ তায়ালা কিন্তু জোর করছেন না। স্বচক্ষে প্রমাণ দেখে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছেন। দোজখের শাস্তি বা বেহেশতের সুখ দেখিয়েও বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছেন না। কারণ এগুলো তো সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্যে উপমা মাত্র। বরং তিনি যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, জীবন সৃষ্টি করলেন সেদিকে তাকাতে বলছেন। কারণ এর মধ্যেই বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

পৃথিবীর বাইরে মহাবিশ্বের সর্বত্র দেখুন। সেখানে প্রায় সবটুকু পদার্থই রয়েছে প্লাজমা ফর্মে। প্রচণ্ড তাপে, প্রচণ্ড চাপে পদার্থের ইলেক্ট্রন আর প্রোটন আলাদা হয়ে গিয়ে সেখানে পদার্থ এখানকার মতো নেই। সেখানে এটম নেই, মলিকিউল নেই। আর পৃথিবীর মধ্যে দেখুন। এখানে স্রষ্টা পদার্থ সৃষ্টি করেছেন কখনো বায়বীয়, কখনো তরল, কখনো কঠিনরূপে। পিরিয়ডিক

টেবিলে শুরুতে আছে হাইড্রোজেন। আর সব শেষে আছে ইউরেনিয়াম। দুটোই প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ওজনের দিক থেকে হাইড্রোজেন সবচেয়ে হালকা আর ইউরেনিয়াম সবচেয়ে ভারী। এটাকে অকাজে ব্যবহার করলে ধ্বংসযজ্ঞ হবে আর ভালো কাজে ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে, যেমনটা ফ্রান্সসহ অনেক দেশই করছে।

আবার একটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে তিনটি প্রোটন আর তিনটি নিউট্রন থাকলে সেটা হয় লিথিয়াম। যদি একটা বাড়িয়ে দেয়া হয়–তিনটার জায়গায় চারটা করে দেয়া হয়, তাহলে সেটা বেরিলিয়াম হয়ে যাবে। তখন এটা আবার অন্যরকম হবে–আনস্টেবল। আবার যদি ছয়টা করে দেয়া হয়, হবে কার্বন। অর্থাৎ একটা নিউট্রন, একটা প্রোটন–এই বিন্যাসটা বদলে দিলে কখনো এটা গ্যাস, কখনো লিকুইড, কখনো-বা সলিড, কখনো এটা এই রঙের, কখনো ওই রঙের হয়ে যাচ্ছে। সামান্য একটু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পদার্থের অবস্থা কীরকম বদলে যাচ্ছে–ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে।

কত বড় সুফি ছিলেন বড়পীর (র)! তিনি বলছেন যে, সৃষ্টি করা জিনিসগুলো দেখ, দলিলটা দেখ, দলিলটা দেখে স্রষ্টাকে দেখ। দলিল দেখে স্রষ্টাকে বোঝার চেষ্টা করো। পদার্থকে ভালো করে বোঝো। নিজের ভেতরটাকে বোঝো।

তিনি যখন নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে নজর দিতে বলেছেন, ডিএনএ মলিকিউল সম্পর্কে কোনো ধারণা কি তখন মানুষের ছিল? এই তো সেদিন, বিংশ শতাব্দীর ৫০-এর দশকে কেমব্রিজে ডিএনএ মলিকিউলের গঠন আবিষ্কৃত হলো যে, ডিএনএ আমাদের অর্থাৎ মানুষের প্রাণের নীলনকশা হিসেবে কাজ করছে। ধরুন, আমরা যে খাবার খাই, সেটা প্রোটিন হলে পাকস্থলীতে ঢোকার পর বিভিন্ন এমাইনো এসিডে এটা ভাঙছে। আবার এক ধরনের ট্রান্সফার আরএনএ আছে, যা এই এমাইনো এসিডগুলোকে নিয়ে গিয়ে একটা বিশেষ জিওমেট্রিক্যাল পজিশনে সংযুক্ত করছে। এখানে আপনার-আমার সরাসরি কোনো ভূমিকা নেই। আমরা এর জন্যে কোনো অর্ডার বা নির্দেশও দেই নি। সব হচ্ছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে, একটি ফ্লো-চার্ট অনুসরণ করে, একের পর এক।

যেমনটা দেখা যায় পেপার মিলে–মেশিনের একপাশে আখের ছোবড়া, পুরনো কাগজ, পাতলা কাঠ–সবকিছু ঢোকানো হচ্ছে আর মেশিনের ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসছে ঝকঝকে সাদা কাগজ। পুরো ঘটনাটা কিন্তু এমনি এমনি হয় না। কীভাবে প্রসেসিং করতে হবে, তার একটা ফ্লো-চার্ট আছে।

প্রথমে এটা দাও, তারপরে পানি দাও, তারপরে এটা করো, ওটা করো, তাহলেই ওপাশে বের হয়ে আসবে সুন্দর সাদা কাগজ। এবং ইঞ্জিনিয়াররা এই ফ্লো-চার্ট আগেই তৈরি করে দিয়েছেন বলেই ওদিকে কাগজ বের হতে পারছে।

একবার চিন্তা করুন, একটি কাগজকলের জন্যে যদি এরকম ফ্লো-চার্ট থাকে, তাহলে মানুষেরও তো তা আছে। তাহলে এই ফ্লো-চার্ট কে তৈরি করল? শুধু তা-ই নয়, একটু চিন্তা করে দেখুন, মানুষের মতো এত দুর্বল জীব পৃথিবীতে আর নেই। একটা বাছুর জন্ম নেয়ার কয়েক সেকেন্ড পরে তিড়িং-বিড়িং করে মায়ের কাছে গিয়ে দুধ পান করে। মানুষ কিন্তু এটা পারে না। মানবশিশুকে খাইয়ে দিতে হয়, শুইয়ে দিতে হয়, সবকিছুই তাকে করে দিতে হয়। এসব তো বাইরের কাজ, কিন্তু তার শরীরের ভেতরে অন্যান্য যা যা কাজ হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে কিন্তু তাকে কোনো চিন্তা করতে হয় না। এর জন্যে কোনো নির্দেশও দিতে হয় না। সবই হচ্ছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। জ্ঞানী লোকেরও হচ্ছে, অজ্ঞানীরও হচ্ছে; যাকে আমরা পাগল বলি, তার ক্ষেত্রেও হচ্ছে, যারা পাগল নন তাদেরও হচ্ছে; কম জানা লোকেরও হচ্ছে, বেশি জানা লোকেরও হচ্ছে। তাহলে এই ফ্লো-চার্টটা কে তৈরি করে দিলেন? এটা কি আপনা-আপনিই হয়ে গেল?

হযরত বড়পীর (র) এজন্যেই নিজের দিকে তাকাতে বলেছেন। তাহলেই মানুষ বুঝতে পারবে, এই যে কয়েকশ কোটি মানুষ আছে পৃথিবীতে, কেউ কারো মতো নয়। কারো জিনের সাথে কারো জিনের হুবহু মিল নেই। ডিএনএ-র গঠনেও কোনো মিল নেই। এই যে সৃষ্টিবৈচিত্র্য, এটা বোঝার জন্যে মহাবিশ্বের শেষ প্রান্তে যে নিদর্শন আছে সেটা যেমন দেখতে হবে, তেমনি শরীর নামক যে মহাবিশ্ব আছে, সেটাও বুঝতে হবে। তবে শরীরের এই যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ, এটা বোঝার জন্যে বেশ আয়োজন করতে হয়।

যেমন, আগেই বলেছি, একটা হাতি দেখতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। দিনের আলোয় যেমন দেখতে পারি, তেমনি রাতের আঁধারেও হাতির অস্তিত্ব বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু একটা ইলেক্ট্রনকে গামা-রে দিয়ে দেখতে হয়। আর গামা-রে তৈরি করতে অনেক সময় লাগে। শরীরের ভেতরে কী হচ্ছে, তা বোঝার জন্যে এক্স-রে ছাড়া হয় না। কেন? যাকে দেখছি তা, যা দিয়ে দেখছি তার চেয়ে বড় হতে হবে। ঘুরিয়ে যদি বলি–যা দিয়ে দেখছি তা, যাকে দেখছি তার চেয়ে ছোট হতে হবে। এজন্যেই সুইজারল্যান্ডের সার্ন ল্যাবরেটরিতে লার্জ হ্যাডরন কোলাইডার দিয়ে পদার্থের

ক্ষুদ্রতম কণাটাকেও জানার জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ বিগ ব্যাং-এর মধ্য দিয়ে পৃথিবী এবং বাদবাকি যা-কিছু সৃষ্টি, এর সবই যেহেতু স্রষ্টার দলিল, এগুলো বোঝার মধ্য দিয়েই আমরা স্রষ্টাকে বুঝতে পারব।

হযরত আলী (রা) সম্পর্কে নবীজী (স) বলেছিলেন, 'আমি যদি জ্ঞানের নগরী হই, তাহলে এর দরজা হচ্ছে আলী।' সে হচ্ছে গেট, তুর্কি ভাষায় যাকে বলে 'বাব'। হযরত আলীকে কেন নবীজী এই অভিধায় অভিহিত করলেন, সে সম্পর্কে আমরা আসব একটু পরে। তার আগে ইমাম আলীর গাণিতিক পাণ্ডিত্যের বিষয়টা আমরা একটু দেখি। অঙ্কশাস্ত্রের দারুণ প্রতিভা ছিল তাঁর। এ নিয়ে তো মজার এক ঘটনা আছে।

দুজন লোক রুটি খাচ্ছে। একজনের কাছে ছয়টা রুটি আর একজনের কাছে চারটা রুটি। এমন সময় এক মুসাফির এলো তাদের কাছে। বলল, ভাই আমি খুব ক্ষুধার্ত। সেই দুই ব্যক্তি বলল, ঠিক আছে, আমাদের সাথে রুটি খেতে পারো। তারা তিনজনে মিলে খেলো। কীভাবে? ছয়টা আর চারটা মিলে হয় ১০টা রুটি। ভাগ হলো এভাবে–তিন জনে তিনটি করে নয়টি রুটি। আর একটি রুটি তিন ভাগ করে তিন জনে নিল, অর্থাৎ প্রত্যেকে পেয়েছে এক তৃতীয়াংশ করে। খাওয়ার পর খুশি হয়ে ক্ষুধার্ত মুসাফির তাদের দুজনকে কিছু অর্থ দিতে চাইল, রুটির বিনিময়মূল্য হিসেবে। তারা বলল, আমরা তো তোমাকে এমনিই খাইয়েছি। কিন্তু মুসাফির নাছোড়বান্দা। একরকম জোর করেই ১০টি মুদ্রা দিয়ে সে ভাগাভাগি করে নিতে বলল।

এখন কীভাবে ভাগ করা হবে? যার ছয়টা রুটি ছিল, সে বলল, ভাই আমি নিচ্ছি ছয় রিয়েল, তুমি নাও চার রিয়েল। যার ভাগে চার রিয়েল পড়ল সে বলল, আরে ভাই আমার যদি আর একখানা রুটি বেশি হতো আর তোমার যদি আর একখানা রুটি কম হতো, তাহলে তো দুজনেই পাঁচটা করে মুদ্রা পেতাম। তো এই একখানা রুটির জন্যে তুমি আবার দুই রিয়েল বেশি নিয়ে নেবে কেন? সমান সমান করো। খামাখা একটা রুটির জন্যে এমন করছ, এটা তো ঠিক না। কিন্তু অন্যজন এটা মানতে চাইছে না।

তারা দুজনেই জানত যে, ইমাম আলী জ্ঞানী ব্যক্তি। এর একটা সুরাহা হবে ভেবে দুজনেই গেল তাঁর কাছে। সব শুনে চারটি মুদ্রা যে পেল, তাকে তিনি আস্তে করে বললেন, যা পাচ্ছ তা-ই তাড়াতাড়ি নিয়ে নাও। সে-ও আলী (রা)-এর কথায় চারটি মুদ্রা নিয়েই চলে গেল। যেতে যেতে হঠাৎ তার মনে হলো, আরে জিজ্ঞেস করলাম না তো উনি আমাকে কেন বললেন, তাড়াতাড়ি নিয়ে চলে যাও। মানেটা কী? কারণটা তো বুঝতে হবে। সে আবার এলো

ইমাম আলীর কাছে–আচ্ছা, আপনি আমাকে কেন এরকম বললেন?

এবার ইমাম আলী বুঝিয়ে বললেন যে, তুমি তো আসলে হিসাব মতে চার রিয়েলও পাও না। কারণ চারটি রুটির মধ্যে তিনটি তুমি নিজেই খেয়েছ। আরেকটি রুটির এক তৃতীয়াংশও গেছে তোমার পেটে। তার মানে তুমি মুসাফিরকে দিয়েছ একটি রুটির মাত্র তিন ভাগের দুই ভাগ। হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে, তুমি মাত্র দুটি মুদ্রা পাও। চারটি মুদ্রা পেলে তুমি তো অনেক বেশিই পাচ্ছ।

হযরত আলীর দূরদৃষ্টি আর অন্তর্দৃষ্টি যে কীরকম ছিল, সেটা বোঝার জন্যে যে বিবৃতি উল্লেখ করছি সেটাই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন, 'মার্কারি অর্থাৎ পারদের মধ্য দিয়ে থান্ডারবোল্ট বা বজ্র প্রবাহিত করার মাধ্যমে একে স্বর্ণে রূপান্তরিত করতে পারবে যে, সে হয়ে যাবে লর্ড অব দি ইউনিভার্স–বিশ্বের অধীশ্বর।' তিনি যখন এ কথাটি বললেন, তখনো কিন্তু পিরিয়ডিক টেবিল আবিষ্কৃত হয় নি। অথচ কী অদ্ভুতভাবে তিনি একথা বললেন!

পরবর্তীতে আমরা পিরিয়ডিক টেবিলে কী দেখলাম? মার্কারির এটমিক নম্বর ৮০। এর মানে হলো মার্কারির এটমের মধ্যে ৮০টি ইলেক্ট্রন আছে আর ৮০টি প্রোটন আছে। আর গোল্ড বা স্বর্ণের (অরাম) এটমিক নম্বর ৭৯, অর্থাৎ এর এটমের মধ্যে ৭৯টি ইলেক্ট্রন এবং ৭৯টি প্রোটন আছে। তাহলে মার্কারির সঙ্গে গোল্ডের তফাত হচ্ছে একটি প্রোটনের। ইলেকট্রন নেগেটিভলি চার্জড এবং প্রোটন পজিটিভলি চার্জড। এখন যদি একটা থান্ডারবোল্ট দিয়ে মার্কারির একটা প্রোটনকে নিউট্রালাইজ করা যায়, তাহলে প্রোটনের সংখ্যা একটা কমে গিয়ে মার্কারি আর গোল্ডের প্রোটন সংখ্যা সমান হয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন হলো, ইমাম আলী কী করে বুঝলেন যে, পিরিয়ডিক টেবিলে মার্কারি আর সোনা পাশাপাশি থাকে? তখনো পিরিয়ডিক টেবিলের কোনো ধারণাই মানুষের ছিল না। কাশ্‌ফের জগতে বিচরণ না করলে একথা কীভাবে বলা সম্ভব? আসলে আজকে বিজ্ঞান আমাদেরকে যে সত্যে উপনীত করিয়েছে, সে সত্যে তিনি অনেকদিন আগেই উপনীত হয়েছিলেন।

পরবর্তীতে রসায়নবিদরা নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকশনের মাধ্যমে মার্কারি-কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মার্কারি থেকে রূপান্তরিত গোল্ডের যে বিভিন্ন আইসোটোপ তৈরি হয়, এগুলোর আবার আয়ুষ্কাল থাকে। এই আয়ুর হাফ লাইফ মাপা হয়। হাফ লাইফ মানে হলো আজকে যদি ১০০টা এটম রাখি, আর যদি পাঁচ ঘণ্টা হয় তার হাফ লাইফ, পাঁচ ঘণ্টা পরে এসে দেখব ১০০ এটমের মধ্যে ৫০টা অন্যকিছুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

ধরুন, যে গোল্ড আইসোটোপের আয়ু ৩.৩ দিন, সেই সময়ের মধ্যে সেটি যারা দেখবে সবাই বলবে যে, আসলেই তো সোনা, চকচক করছে। কষ্টিপাথরে ঘষেও দেখা যাবে, সত্যিই সোনা। কেউ চাইলে এই সময়ের মধ্যে সোনার দামেই তা বিক্রি করে ফেলতে পারে। কিন্তু আসল ঘটনা ঘটবে তিন দিন পরে। তিন দিন পরে দেখা যাবে, ঐ সোনার অর্ধেকই ভিন্ন পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার ৩.৩ দিন পরে বাকি অর্ধেক সোনা আবার তার অর্ধেকে পরিণত হবে। এভাবে আরো কিছুদিন পর দেখা যাবে যে, সোনা তো আর সোনা নেই!

ইমাম আলী যে বলেছিলেন, সোনা তৈরি করতে পারলে সে লর্ড অব দি ইউনিভার্স হয়ে যেত, কিন্তু লর্ড অব দি ইউনিভার্স হওয়া কি এতই সহজ! একমাত্র বিশ্বের কারিগরই জানেন, এটা কী করে করতে হয়। আমাদেরকে সামান্য একটু লোভ দিয়ে রেখেছেন যে, তুমি মার্কারি-কে সোনা করো। অল্প সময়ের জন্যে করো। তোমার মনে হবে যে, তুমি সোনা তৈরি করতে পেরেছ। কিন্তু আসলে তা না।

যারা সত্যিকার অর্থে কাশ্‌ফের জগতে বিচরণ করতে পারেন, তারা দেখেন অনেক কিছু। তারা জানেন অনেক কিছু। কিন্তু তাদের দেখে আপনি-আমি কিছুই বুঝতে পারব না। তারা সেলাই করা কাপড় পরেন, সেলাই ছাড়া কাপড়ও পরেন। তারা যেমন আলখাল্লা পরেন, তেমনি স্যুট পরেন, কখনো উলের জামাও পরেন। তিনি সেলাই করা বস্ত্রে থাকুন বা লম্বা আলখাল্লাতেই থাকুন বা স্যুটে থাকুন না কেন, তাকে দেখে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না যে, তিনি আসলে কী। কাশ্‌ফের জগৎ এত উন্নত। আপনারা ভাগ্যবান। কারণ কাশ্‌ফের সেই অনন্য জগতে বিচরণ করার জন্যে আপনারা এখানে এসেছেন। সেই জগতে প্রবেশের জন্যে মনোজগতকে তৈরি করার একটি মাধ্যম হচ্ছে এই কোয়ান্টাম মেথড।

তরিকতের ইমামগণ মানুষের শরীরে ১০টি স্টেশন বা লতিফা খুঁজে পেয়েছেন, যেখানে স্রষ্টার স্মরণ বা জিকির হতে থাকে। ইমামুত তরিকত আরেকটি স্টেশন আবিষ্কার করেছেন, যার নাম তিনি দিয়েছেন লতিফায়ে খ্‌লা। তার মতে, খ্‌লা হচ্ছে বিনয়ের উৎস। খ্‌লা মানে খালি। পদার্থবিদ্যার যে-কোনো ছাত্রের এই খালি বা শূন্যের ব্যাপারে আগ্রহ আছে। যে কারণে এই লতিফায়ে খ্‌লার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন।

ধরুন, একটা হাইড্রোজেন এটম। এর নিউক্লিয়াসে আছে একটা প্রোটন, যাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে একটা ইলেক্ট্রন। যে দূরত্ব বজায় রেখে ইলেক্ট্রনটি

নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরছে, তা হলো $১০^{-৮}$ সে.মি.। নিউক্লিয়াসের রেডিয়াস হচ্ছে $১০^{-১৩}$ সে.মি.। এটমিক রেডিয়াস ও নিউক্লিয়ার রেডিয়াস-এর অনুপাত হলো $= ১০^{৫}$ (এক লক্ষ)। আরো সহজভাবে যদি বলি– ধরুন, ঢাকা শহরটা হচ্ছে হাইড্রোজেন এটমের নিউক্লিয়াস, তাহলে তার ইলেকট্রনটা কোথায় আছে? এক লক্ষ মাইল দূরে। মাঝখানে কী আছে? নাই নাই নাই, খালি। অর্থাৎ খ্‌লা। তার মানে হলো, পদার্থের ভেতরকার অধিকাংশই ফাঁকা।

এই খ্‌লার মধেই বিনয় থাকে। এই বিনয়টা কোত্থেকে আসে? এটার জন্যে একটা হিসাব করতে হবে। ধরুন, এক কিউবিক সেন্টিমিটার পরিমাণের একটি নিউক্লিয়ার ম্যাটারের ওজন বের করছেন। এখন মানুষের গড় ওজন যদি ৬৫ কেজি করে ধরি, তাহলে পৃথিবীর ৬০০ কোটি মানুষের সবার ওজনের চেয়েও এর ওজন বেশি। আপনি যদি পৃথিবীর সব মানুষকে নিয়ে পাল্লার একদিকে রাখেন, আর একটা লুডুর ছক্কার ভেতরে সেই নিউক্লিয়ার ম্যাটার ঢুকিয়ে পাল্লার আরেকদিকে সেই ছক্কাটা রাখেন, তাহলে লুডুর ছক্কার ওজন বেশি হবে।

তাহলে আমার শরীরের পদার্থগুলো গেল কোথায়? সেই পদার্থ ঐ লুডুর ছক্কার সামান্য অংশে। আমার সমস্ত শরীর ফাঁকা। আর আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে যত নিউক্লিয়াস আছে, তার ম্যাটার ঐ লুডুর ছক্কার সামান্য একটা অংশে গেছে। আরেকজনের শরীরের পদার্থ নিয়ে ঐ লুডুর ছক্কার সামান্য একটা অংশ পূর্ণ হয়। পৃথিবীর ছয় শ কোটি মানুষের শরীরের সব এটমের নিউক্লিয়াস দিলে ছক্কাটা ভরে। তার মানে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কে আমি? আমার অস্তিত্ব কত ক্ষুদ্র! এক সিসি নিউক্লিয়ার ম্যাটারের তুলনায় আমার অস্তিত্ব কিছুই না।

বিনয়টা কিন্তু এই অনুভূতি থেকেই আসে যে, আমি আসলে কত ক্ষুদ্র! এত দর্পভরে আমি এই পৃথিবীতে বিচরণ করি, অথচ আমার মধ্যে অধিকাংশ জিনিস ফাঁকা। আমার মধ্যে যে ম্যাটার আছে, সেটা এক সিসি নিউক্লিয়ার ম্যাটারের একটা সামান্য অংশমাত্র। আমি তাহলে কত নগণ্য! কত সামান্য! কত ক্ষুদ্র! এবং যার মধ্যে যত বেশি নগণ্যতার অনুভূতি আসে, নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের সম্পর্কে সচেতনতার অনুভূতি আর জ্ঞান যার বেশি, সে কিন্তু তত বেশি বিনয়ী হয়। কারণ যে গাছে ফল বেশি ধরে সে গাছ কিন্তু মাটি ছুঁতে চায়। আর যে গাছে ফল ধরে না, সে আকাশ ছুঁতে চায়।

আজকে আমাদের চারদিকে আকাশছোঁয়া লোকের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। মাটিছোঁয়া লোকের সংখ্যা কম। তবে আপনারা ভাগ্যবান। কারণ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এমন একটি জায়গা, যেখানে এসে যে-কেউ মাটিছোঁয়া মানুষ হওয়ার শিক্ষা পান। যে কারণে বিনয়টা আপনাদের মধ্যে সহজে আসে। সেইসাথে জিকির তো আছেই।

আসলে জিকির মানে কিন্তু শুধু নামাজ-রোজা নয়, জিকির মানে শুধু তসবি গোনা নয়; সত্যিকারের জিকির, সবচেয়ে বড় জিকির হচ্ছে, আল্লাহর স্মরণ, প্রভুর স্মরণ। এই স্মরণ শুধু কণ্ঠে নয়, মুখের কথায় নয়; বরং এই স্মরণ যেন হয় ভেতরের সমস্ত সত্তা থেকে, যে খ্‌লা আপনার ভেতরে রয়েছে, সেখান থেকে। যা মওলানা রুমী বলেছেন তার অর্থ হচ্ছে, অন্তরকে তৈরি করলে মেসেজ আসতে থাকবে তারা থেকে, সূর্য থেকে–সবখান থেকে।

আসলে প্রতিদিনের শত ব্যস্ততার মধ্যেও আপনি যদি জিকিরের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেন, অন্তরের ধ্বনি শোনার জন্যে সময় করে নিতে পারেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন বিজ্ঞান এবং সুফিজমের এক মহামিলন ঘটেছে। আপনাদের সবার জীবনে সেই মহামিলন ঘটুক, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

২১ মার্চ ২০১২-তে আয়োজিত কোয়ান্টাম ওয়ার্কশপে 'সায়েন্স এন্ড থট্‌স অব সুফি'স' বিষয়ে তিনি এ আলোচনা করেন

সমগ্র মানব সম্প্রদায় এক পরিবার

আমি যখন এখানে এসে পৌঁছাই তখন গুরুজী বললেন, আমরা একটা ছোটখাটো আয়োজন করেছি। গুরুজীর কাছে এ আয়োজন ছোট হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে কখনোই নয়।

২০০৪ সালে 'কোরআন কণিকা' উদ্বোধনের সময় আমি এসেছিলাম। সেদিন ভাবতে পারি নি, যে বৃক্ষ তিনি রোপণ করেছিলেন 'কোরআন কণিকা'-র নামে, সেটাই একটা মহীরুহ হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে আজ। আমি বিশ্বাস করি, গুরুজীর একনিষ্ঠ চিত্ত এবং তার কর্মচাঞ্চল্যই তাকে এ কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। এবং বলা যায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে পৃথিবীতেই একটি এওয়ার্ড দিয়েছেন বলে এমন একটি ভালো কাজ আজ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

কোরআন আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ গ্রন্থ। এ প্রসঙ্গে কোরআনে বলা হয়েছে, সমস্ত গ্রন্থ, যা আগে আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন বিভিন্ন রসুলদের কাছে, সে-সব গ্রন্থেরই সর্বশেষ পরিবেশন এই কোরআন। এবং সে কারণেই আমরা বলতে পারি, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সাথে এর কোনোরকম কোনো সংঘাত নেই। কারণ আগে যাঁরা এসেছেন তাঁরাও রসুল। মুসা (আ) ইসলামের রসুল, ঈসা (আ) ইসলামের রসুল। তাঁরা একেকজন একেক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে এসেছেন। তাঁরা মনে করেন–তাঁরা পরস্পরের আত্মার আত্মীয়।

ইসলাম বলে, এঁরা সবাই ইসলামের রসুল। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, 'তোমরা রসুলে রসুলে পার্থক্য কোরো না'। তাহলে এ থেকে একটা অপূর্ব বিষয় বোঝা যায় যে, আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত কোনো ধর্মের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। কারণ সব ধর্মই এসেছে এক জায়গা থেকে।

আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। সেই বিজ্ঞানের কথা যদি বলি, বিজ্ঞান কিন্তু কোনো নিয়ম বানায় না। নতুন নিয়ম সৃষ্টি করতে পারে না। বিজ্ঞান শুধু নিয়মটাকে

আবিষ্কার করে মাত্র। নিয়ম সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে যাঁর, তিনিই কেবল নতুন নতুন নিয়ম বানাতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, আজকে যদি ট্রাইক্রো ব্রাহি না আসতেন, যদি ইবনে আশ্-শাতির না আসতেন, আজকে যদি জোহান্স কেপলার না আসতেন, যদি নিকোলাস কোপার্নিকাস না আসতেন, যদি গ্যালিলিও গ্যালিলাই না আসতেন, যদি আইজ্যাক নিউটন না আসতেন, যদি আলবার্ট আইনস্টাইন না আসতেন, তবে সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলো এখন যে নিয়মে চলে, সেগুলো কি অন্য নিয়মে চলত? তা-তো নয়। গ্রহগুলো যেভাবে চলছে, ঘুরছে, আবর্তিত হচ্ছে ঠিক সেভাবেই সব হতো– তারা আসুক বা না আসুক। এরা আসার ফলে, এদের কাজ ও গবেষণার ফলে–এসব গ্রহগুলো কী নিয়মে চলে, সেটা আমরা জানতে পেরেছি।

অর্থাৎ এদের মতো যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা এসব নিয়ম আবিষ্কার করেছেন মাত্র। গ্রহগুলো কীভাবে চলবে, সে নিয়ম তারা সৃষ্টি করেন নি। নিয়ম কেবল তিনিই সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, আমাদের জন্মমৃত্যুর নিয়ন্ত্রক, সকল কর্মের বিধায়ক।

বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, যত ক্ষুদ্রই হোক আর যত বৃহৎ হোক, সৃষ্টিজগতের সকল পদার্থের নিয়মাবলিকে আবিষ্কার করা, এরা কী নিয়মে চলছে সেই সত্যকে উন্মোচন করা, সত্যের অনুসন্ধান করা। ধর্মও এই একই কথা বলে যে, সত্যসহকারে এই ধর্ম পাঠানো হয়েছে। আর এই সত্যই হচ্ছে কোরআনের প্রাণ। বার বার কোরআনে এটি বলা হয়েছে। নবীজী (স)-কে আল্লাহ বলেছেন, 'এই কিতাব নাজিল করা হয়েছে সত্যসহকারে'। অর্থাৎ সত্যের ওপর এতখানি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কোরআনে।

আর বিজ্ঞান তো সেই সত্যকেই আবিষ্কার করে। তাহলে বিজ্ঞান ও কোরআনের মধ্যে তো কোনো বিরোধ নেই; বরং আছে একটা ঐক্য, সংহতি আর সামঞ্জস্য। দুয়ের মধ্যে একটা হারমোনি আছে। এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই সত্য। আজ এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, এ দুয়ে কোনো বিরোধ নেই।

কোরআন অনুধাবন করে মুসলিম বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় নানা সত্য আবিষ্কার করেছেন। চাঁদের অনেকগুলো জ্বালামুখের নামকরণ করা হয়েছে ইবনে সিনা, ওমর খৈয়ামসহ নয় জন মুসলিম বিজ্ঞানীর নামানুসারে। ইন্টারন্যাশনাল এস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশন ১৯৩৫ সালে এটা করেছিল। এসব বিজ্ঞানীরা এই গবেষণার অনুপ্রেরণা কোথায় পেয়েছিলেন?

ঐ যে কোরআনে বার বার বলা হয়েছে, 'হে মানুষ পড়ো', যা ছিল কোরআনের প্রথম কথা। এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণা এসেছে এই পড়া

অর্থাৎ পাঠ করার মধ্য দিয়ে। তাই আজ আমার খুব ভালো লাগছে যে, কোরআনের যে বাণী নাজিল করে আল্লাহ বলেছেন 'পড়ো', সেই বাণী নিয়েই আজ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন একটি অডিও সিডি প্রকাশ করছে 'হে মানুষ শোনো' নামে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে যে অগ্রগতি ও বিপ্লবের সূচনা ঘটেছিল, তাতে ছিল কলমের কথা। এই কলম হলো সিম্বলিক। কলম হলো নলেজ। এখন মনে রাখতে হবে, আমাদের এক হাতে যদি আজ কালাম থাকে আর অন্য হাতে থাকে কলম অর্থাৎ কালাম ও কলমের একটা অপূর্ব সমন্বয় যদি আমরা ঘটাতে পারি, তাহলে মানুষের আর কোনো দুর্দশা, বিপর্যয় থাকে না। পশ্চিমের হাতে আজ কলম আছে কিন্তু কালাম নাই। আর আমাদের হাতে কালাম আছে কিন্তু আমরা কলমের ব্যবহার জানি না।

কলমকে আমি এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতীক হিসেবে বোঝাতে চাচ্ছি। এখন আমরা যে শতাব্দীতে আমরা বাস করছি, সেটাকে আমরা বলি নলেজ ইকোনমি। অনেক দেশের কাঁচামাল নেই কিন্তু তারা তাদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উন্নতির শিখরে পৌঁছে গেছে। যেমন : জাপান। তারা বাইরে থেকে কিছু জিনিস এনে তাতে নিজেদের জ্ঞান ব্যবহার করে তার মূল্য বাড়িয়ে বাজারে ছাড়ছে। আজকের যুগে জ্ঞানই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাঁচামাল। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত একটা হাদীস আছে, 'জ্ঞান আমার অস্ত্র'।

কোরআনের একটা আয়াত আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত ও আলোড়িত করে। ১০ নং সূরার ১০১ নং আয়াতে রসুল (স)-কে আল্লাহ বলছেন, 'আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা-কিছু আছে, তার প্রতিটি জিনিসের দিকে নজর দিতে বলো'। এই কথাটাই হলো পুরো সায়েন্স-এর এজেন্ডা–'নজর' দেয়া। 'লার্জেস্ট অব দ্য লার্জ' এবং 'স্মলেস্ট অব দ্য স্মল'–এই যে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ছোট দুটো জগত, এর একটি নিয়ে কথা বলে নিউটনিয়ান মেকানিক্স আর দ্বিতীয় জগতটি নিয়ে কথা বলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স, যা আমরা বিজ্ঞানীরা এখনো ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারি নি। সে আরেক জগত।

এই যে সৃষ্টিজগতে দুটি ভিন্ন জগত আর তার ভিন্ন নিয়ম, একে স্রষ্টা অপূর্ব নিয়মে পরিচালনা করছেন। এ দুই জগতের মধ্যবর্তী যা-কিছু আছে, তাকেও তিনি টিকিয়ে রেখেছেন, নিয়ন্ত্রণ করছেন, লালন করছেন, জীব ও জড়কে তিনি পরিচালিত করছেন–এ এক অপূর্ব খেলা। আর বিজ্ঞান এই খেলাকে আবিষ্কার করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। তখন এই বিশ্ব রচনায় যে নিয়মকানুন, যে সাম্য, যে সৌন্দর্য প্রতিফলিত হয় তা যখন

মানুষের জ্ঞানের দরজায় আসে তখন মানুষ পরম কৃতজ্ঞতায় মস্তক অবনত করে বলে, আল্লাহ তুমি কত বড়! কত মহান! কী সুন্দর আর অপূর্ব তোমার সৃষ্টি! বিজ্ঞানের নিত্যনূতন গবেষণা আর কাজ কিন্তু মানুষকে সেই অবস্থায় পৌঁছে যেতে সাহায্য করে।

আজ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কোরআন ও হাদীসের বাণী নিয়ে যে অডিও সিডি প্রকাশ করতে যাচ্ছে, তার ভাষাটা আমার কাছে খুব সুন্দর মনে হয়েছে। এত সহজ-সাবলীল ভাষা! একেকটা কণিকা মনে হয় যেন সত্যিই একেকটা খনি, এমন এমন রত্ন এর মধ্যে আছে! এবং এটা বিমূর্তভাবে নয়, বরং অত্যন্ত বোধগম্য ভাষায় প্রতিদিনের জীবনযাপন আর প্রাণধারণের জন্যে উপযোগী করে সংকলন করেছেন গুরুজী।

কথাগুলো এমন সুন্দরভাবে লেখা যে, প্রতিটি কণিকাই যেন একেকটি ছোট ছোট কবিতা। কবিতার মতো করে তিনি লিখেছেন। এখানে খুব ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কোরআনের মূল স্পিরিট। আমি বলি, কোরআন অপূর্ব এক স্বর্গীয় সাহিত্য। যখন তেলাওয়াত বা কেরাত করে পড়া হয় তখন এক অপূর্ব ছন্দময় সংগীত। কাব্যছন্দ, ধ্বনিগত মিল আর ব্যঞ্জনা– সবমিলিয়ে এ এক অসাধারণ ঐকতানে ভরা গ্রন্থ।

আমি অনেককে বলেছি, বিশ্বাস যদি করতে না-ই চাও, কোরো না; কিন্তু একটা গ্রন্থ পড়ে দেখতে কী অসুবিধে? আমরা তো শেক্সপিয়ার পড়ি, রবীন্দ্রনাথ পড়ি, নজরুল পড়ি, টেনিসন, হোমার, এলিয়ট পড়ি; কোরআন কেন একবার পড়ে দেখি না? পড়ে দেখ–এটি কি তোমাকে ধ্বংস করার জন্যে পাঠানো হয়েছে, নাকি তোমার জীবনকে সুন্দর করার জন্যে পাঠানো হয়েছে? আমরা কবিতায় পড়ি–*যে জন দিবসে মনের হরষে/ জ্বালায় মোমের বাতি,/ আশু গৃহে তার দেখিবে না আর/ নিশীথে প্রদীপ ভাতি*। এখানে অপচয়ের পরিণতি সম্বন্ধে সাবধান করা হয়েছে, অপচয়কে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কোরআনে সূরা আনআম-এ বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের অপছন্দ করেন'।

অর্থাৎ আমরা জীবনভিত্তিক সাহিত্যে যা পাই, সে বিষয়গুলোও কোরআনে আছে। তাই আমি সবাইকে বলি, তুমি একবার শুধু পড়ে দেখ। বুঝে দেখ। তোমাকে কোনোরকম জোর করা হবে না। ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই। কারণ সত্য অসত্য থেকে এত স্পষ্ট যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনোরকম জোর করার দরকার পড়ে না। গুরুজী অনেক সুন্দরভাবে পুরো ব্যাপারটা এখানে তুলে ধরেছেন, উপস্থাপন করেছেন।

একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা বোঝানো যেতে পারে। আমরা যখন নতুন কোনো ফ্রিজ কিংবা ইলেকট্রনিক গ্যাজেট বা ডিভাইস কিনি, তখন কিছু না বুঝেই এটা-সেটা চালাতে শুরু করি না। প্রথমে পুরো ম্যানুয়ালটা পড়ে দেখি। তারপর চালাই। তখন ওটা ভালোভাবে চালাতে আর কোনো অসুবিধা থাকে না। তেমনি কোরআন হচ্ছে মানুষের সংবিধান, সৃষ্টির সংবিধান। সুন্দরভাবে দেশ পরিচালনার জন্যে যেমন সব দেশেরই একেকটা সংবিধান রয়েছে, পুরো সৃষ্টিজগত পরিচালনার জন্যেও এটি তেমনি একটি ম্যানুয়াল।

প্রায় ৩০ মিলিয়ন ধরনের প্রাণ আছে এ পৃথিবীতে। যেমন, শুঁয়োপোকা–প্রাথমিক অবস্থায় একে হয়তো অসুন্দর লাগে, কিন্তু এটাই একসময় সুন্দর প্রজাপতিতে রূপ নেয়। মানুষকে একটা সংবেদনশীল মন তৈরি করে দিয়ে আল্লাহ তাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছেন–হে মানুষ শোনো! শুধু তুমি একা নও, পুরো সৃষ্টিজগতের সবাইকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব তোমার। তোমাকে এখানে গার্ডিয়ান হিসেবে পাঠানো হয়েছে, একে শোষণ করার জন্যে নয়। সেই দায়িত্ব তুমি পালন করো। কোরআনকে তাই বলা যেতে পারে মানুষের জীবনযাপনের ম্যানুয়াল। দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দর করার জন্যে, সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্যেই এর আবির্ভাব।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে, *তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি*। অর্থাৎ আমাকে যে দায়িত্ব তুমি দিয়েছ, তার ভার বইবার শক্তি তুমি আমাকে দাও। এমন দায়িত্ব দিও না, যার ভার সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই। কোরআনে সূরা বাকারা-র শেষের দিকে বলা হয়েছে, মানুষকে ঠিক ততখানি ভার দেয়া হয় যতখানি সে সহ্য করতে পারবে। অর্থাৎ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয় না। আমাদের স্রষ্টা কত সহানুভূতিশীল আমাদের ওপর!

আল্লাহ বলেছেন, 'আমি মানুষকে দুর্বল করে তৈরি করেছি।' তারপরও আল্লাহ মানুষকে অধিকাংশ সৃষ্টির ওপর কতভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন! শেক্সপিয়ার তার *অ্যাজ ইউ লাইক ইট*-এ মানুষের জীবনের সাতটা অধ্যায় নিয়ে লিখেছেন–মানুষ বৃদ্ধ বয়সে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে যায়, যখন দাঁত থাকে না, দৃষ্টি থাকে না, স্বাদ থাকে না, একটা পর্যায়ে কিছুই থাকে না। কোরআনে বলা হয়েছে, কিছু কিছু লোককে আমি দীর্ঘজীবন দান করি, দীর্ঘ জীবনের একপর্যায়ে সে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছায়, যখন সে শৈশবের অবস্থায় পৌঁছে যায়। অর্থাৎ তখন স্মৃতিশক্তি তেমন কাজ করে না, বেখেয়াল হয়ে পড়ে, সে শিশুর মতো হয়ে যায়।

সুতরাং আমরা যখন প্রার্থনা করব তখন শুধু 'আমাকে দীর্ঘজীবন দান করো' একথা নয়; বরং আমাদের দীর্ঘজীবনের ব্যাপারে প্রার্থনা হওয়া উচিত– 'হে আল্লাহ! তোমার সৃষ্টিকে বোঝার জন্যে, তোমার সৃষ্টির সেবা করার জন্যে তুমি যদি আমাকে দীর্ঘজীবন দাও, তাহলে আমাকে প্রতি মুহূর্তে কর্মক্ষম রাখো, যেন আমি তোমার প্রশংসা করতে পারি ও তোমার সৃষ্টির সেবা করতে পারি। সেই হিসাবে তুমি আমাকে যতদিন রাখতে চাও, রাখো এই পৃথিবীতে।' এটাই হতে পারে সত্যিকারের প্রার্থনা।

অর্থাৎ আমরা কর্মহীন দীর্ঘজীবন চাই না। যতদিন আমরা পৃথিবীতে থাকি, আমরা চাই কর্মময় সুস্থ জীবন। আর আমরা অনেক কিছুই জানি, শুধু একটি বিষয়ে জানি না–কতদিন আমরা পৃথিবীতে থাকব।

এ প্রসঙ্গে আমার জীবনের একটা ঘটনা বলি। দুজন মানুষ, যারা আমার উচ্চতর পড়াশোনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আমাকে পথনির্দেশ করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন, উপদেশ-পরামর্শ দিয়েছেন–তারা হলেন, পরিসংখ্যানবিদ ও সাহিত্যিক ড. কাজী মোতাহার হোসেন এবং নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. আবদুস সালাম। এছাড়া আরো একজন ছিলেন, যিনি আমার প্রশাসনিক কর্মজীবনে আমাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছেন। তিনি একজন আইসিএস অফিসার–ড. আই এইচ ওসমানী। ভারতের উত্তর প্রদেশের মানুষ। ১৯৮৫ সালে তিনি জাতিসংঘে সিনিয়র এনার্জি এডভাইজার হিসেবে কাজ করেছেন, তারও আগে ৬০-এর দশকে আমি তাকে পাকিস্তান এটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে পেয়েছিলাম। পরবর্তীতে আমরা একসঙ্গে অনেক কাজ করেছি।

অসম্ভব কর্মচঞ্চল একজন মানুষ ছিলেন তিনি। দেখা গেল, রাত ন-টার সময় ঢাকায় এসে নেমেছেন; এসেই কোনো একটা কাজের প্রসঙ্গে আমাকে বললেন, এ ব্যাপারে এখন কার সাথে দেখা করতে পারি বলো। আমি তখন হয়তো সারাদিনের কাজ শেষ করে সবে বাসায় ফিরেছি। আমি বলতাম, মাত্র এসেছেন, বিশ্রাম করুন। কাজের কথা আগামীকাল হবে। তিনি বলতেন, কেন? তুমি কি মনে করেছ আমি টায়ার্ড হয়ে পড়েছি? আরো তো এক-দেড় ঘণ্টা কাজ করতে পারি।

সব কাজেই তিনি এরকম তাড়াহুড়ো করতেন, যখনকার কাজ ঠিক তখনই অর্থাৎ দিনের কাজটা দিনেই শেষ করা চাই তার। সবাইকে এভাবে ব্যস্ত রাখতেন। একদিন আমি ওনাকে বললাম, দেখুন, আপনার এ অভ্যাসটা আমার মধ্যেও চলে এসেছে। আমিও খুব চঞ্চল হয়ে পড়েছি কাজের

ব্যাপারে। সবসময় কোনো না কোনো কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি, কোনো কাজ না থাকলে অস্থির হয়ে উঠছি। আমাকে তিনি 'বেটা' বলে সম্বোধন করতেন– আমার এই অনুযোগ শুনে বললেন, 'দেখ বেটা, আমার কী কী সম্পদ আছে আমি জানি; কী বইপত্র আছে, আসবাবপত্র আছে জানি, আমার স্ত্রীর কী সম্পত্তি আছে তা-ও জানি, কোথায় জমিজমা আছে, ব্যাংকে কত জমা আছে, সেটাও জানি; জানি না কেবল একটা জিনিস–পৃথিবীতে আমার কতক্ষণ সময় আছে।' কথাটা আমাকে আমাকে ভীষণ আলোড়িত করেছিল।

তাই আমাদের সবার প্রার্থনা হওয়া উচিত একটাই–জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমরা সুস্থ ও কর্মক্ষম থেকে যেন মানুষকে সেবা দিয়ে যেতে পারি। এটাই হবে আমাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নেয়ামত। আপনারা এখানে আসছেন, ধ্যানমগ্ন হয়ে একাগ্রচিত্ত হওয়ার সাধনা করছেন। এর ফলে আপনার মধ্যে একটা উজ্জীবন ঘটবে, তা দিয়ে আমৃত্যু মানুষের জন্যে আপনারা কাজ করবেন, এই প্রার্থনা আমি করি।

আর আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই এবং দোয়া করি, তিনি গুরুজীকে আরো অনেক কাজ করার শক্তি দিন। তিনি কোনো কাজ শুরু করলে খুব সুন্দরভাবে তা শেষ করেন। তার কাজ, তার পরিবেশনা, মানুষের সাথে তার সখ্যতা–এগুলো আমার খুব ভালো লাগে। তিনি যে প্রতিটি কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেন, তা কেবল মানুষকে ভালবাসার কারণে। মানুষকে এবং সব ধরনের সৃষ্টিকে ভালো না বাসলে আল্লাহকে ভালবাসা যায় না।

এখানে দুটো বিষয় আছে। একটি আল্লাহর হক, একটি বান্দার হক। আল্লাহর কোনো একটা বিধান লঙ্ঘন করে ফেললে পরে নতচিত্তে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন। কারণ কোরআনের একাধিক আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও দয়ালু, তাঁর ক্ষমার কোনো শেষ নেই। কিন্তু একজন বান্দার বা মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করলে কিংবা মানুষের প্রতি কোনো অন্যায় করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ না ঐ বান্দা এজন্যে ক্ষমা না করে।

অর্থাৎ ঘুরেফিরে সেই একই কথা–সৃষ্টিকে ভালবাসা। গুরুজীর সমস্ত চেতনা আর কাজের মধ্যে আমি এ ব্যাপারটি বিভিন্নভাবে লক্ষ করেছি। আমি দেখেছি, তিনি এই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছেন। দেশের সুবিধাবঞ্চিত জায়গায় তিনি মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালিয়েছেন। মানুষের মাঝে জীবনের প্রতি আগ্রহ ও আশাবাদ যুগিয়ে যাচ্ছেন শুধু সৃষ্টির প্রতি ভালবাসার কারণে। সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা তখনই হয়, যখন ওপরওয়ালার তরফ থেকে

মানুষের মনে একটা তাগিদ আসে। আল্লাহ গুরুজীকে সেই তাগিদ দিয়েছেন মানুষকে ভালবাসার জন্যে।

এভাবে আমরা সবাই যেন মানুষকে ভালবাসতে পারি। মানুষ মানুষের জন্যে। আমরা যেন বলতে পারি, সব মানুষ অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতি এক পরিবার। পবিত্র কোরআনে আছে, কোনো মুসলমান সাম্প্রদায়িক হতে পারে না, কোনো সাম্প্রদায়িক লোক মুসলমান হতে পারে না। আল্লাহ বলেছেন, হে মানুষ, তোমরা তো একই জাতি। একই সম্প্রদায়। তোমাদের যার কাছে যা-কিছু আছে, সেটা নিয়ে তোমরা নিজেদেরকে সন্তুষ্ট করে রাখো।

'হে মানুষ শোনো' সিডিতে কোরআন ও হাদীসের বাণীর মর্মার্থ অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় সংকলিত হয়েছে। সুললিত কণ্ঠে এর উপস্থাপনা আমার, আপনাদের এবং সব মানুষের মনকে আলোড়িত করুক। সব মানুষের মনে ভালবাসা সৃষ্টি হোক। পৃথিবীতে লোকসংখ্যা অনেক কিন্তু 'মানুষ'-এর সংখ্যা খুব কম। এই মর্মবাণী সংকলন যদি লোকসংখ্যাকে মানুষের সংখ্যায় রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে, তাহলে সেটাই হতে পারে সবচেয়ে বড় কাজ। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি এই সিডি-র উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'হে মানুষ শোনো' সিডির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্য,
১৩ জুলাই ২০১১

কোরআনের শিক্ষা মানুষকে আলোকিত জীবনের পথে পরিচালিত করে

আমি আজই লামা থেকে ফিরেছি। লামায় গিয়ে আমার একটা অদ্ভুত উপলব্ধি হয়েছে। আমি সত্যিই অভিভূত। সুবিধাবঞ্চিত একটা জনগোষ্ঠী, যারা 'মানুষ' নামে অভিহিত, যাদের মধ্যে সব সম্ভাবনা স্রষ্টা দিয়ে রেখেছেন; অথচ তারা একটু যত্ন পায় না, ভালবাসা পায় না–সেই জনগোষ্ঠীর শিশুদেরকে গুরুজী ভালবেসে লালনপালন করছেন, তাদের বড় করে তুলছেন।

ওদের মাঝে তিনি এই আত্মবিশ্বাসটাই জাগিয়ে দিতে চাইছেন যে, পৃথিবীর অন্য যে-কোনো সভ্য দেশের মানুষ যে উচ্চতায় পৌঁছতে পারে, তোমরাও ঠিক সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পারো, এমনকি তার চেয়েও ওপরে। এ প্রয়াস এক অনন্য উদ্যোগ।

এমন আত্মবিশ্বাস জাগানোর ফলে তাদের চোখেমুখে একটা অন্যরকম দীপ্তি আমি দেখেছি। সেখানে এখন একটা নতুন জাগরণের ধারা বইতে শুরু করেছে। শিক্ষার আলো এসেছে। এবং এসব দেখে আমি গুরুজীকে আখ্যায়িত করেছি লামার ল্যাম্প হিসেবে–দ্য ল্যাম্প অব লামা।

আমি মনে করি, এটি একটি মডেল হতে পারে আমাদের দেশের সবখানেই–যেখানে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ আছে, স্নেহের অভাব আছে, আবাসনের অভাব আছে, অন্নের অভাব আছে, বস্ত্রের অভাব আছে, যত্নের অভাব আছে। সে-সব জায়গাতেও যদি এরকম আলো পৌঁছে যায়, তাহলে সমগ্র দেশ আলোকিত হয়ে উঠতে পারে। বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ তখন একটা নতুন স্থান পাবে।

গুরুজীকে আমি অনেক দিন ধরে চিনি। তিনিও কেন জানি না, আমাকে ভালবাসেন। আমি তো বেশ আগে থেকেই কোয়ান্টামের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি সবসময়ের জন্যেই আমার শুভেচ্ছা রয়েছে। কিন্তু এবার একটা অদ্ভুত কথা তিনি বললেন। বললেন, আমি কোয়ান্টামের একজন অভিভাবক। এ-তো এক গুরুদায়িত্ব। আমি যেটা করব

সেটা হলো, আপনাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের সাথে আমার সবসময় সম্পৃক্ততা থাকবে। আপনারা আমাকে পাশে পাবেন–এই আশ্বাস আমি দিতে পারি।

আমি আজকে বলতে চাই, এটা রবিউল আউয়াল মাস এবং এই মাসে শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়, মানবজাতির জন্যে স্রষ্টা একটা বড় আশীর্বাদস্বরূপ আমাদের রসুল (স)-কে পাঠিয়েছিলেন। কোরআনে তাঁকে বলা হয়েছে রহমাতুল্লিল আলামিন; রহমাতুল্লিল মুসলিমিন নয়। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির জন্যে তাঁকে রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে।

আমরা রোল মডেল খুঁজি। সন্তানদের বলি, একে অনুসরণ করো, ওকে অনুসরণ করো। কিন্তু আমরা যদি পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখব, প্রায় সবার ক্ষেত্রেই একটি বা একাধিক ক্ষেত্রে যাকে রোল মডেল হিসেবে অনুসরণ করা যায়, অন্য একটি ক্ষেত্রে তাকে সেভাবে অনুসরণ করা না-ও যেতে পারে।

সাধারণভাবে একজন অলি-আউলিয়া কিংবা একজন ঋষি, এরা সুমহান চরিত্রের অধিকারী। এদের সমস্ত জীবন জুড়ে মানুষের জন্যে ভালবাসা, সৃষ্টির জন্যে ভালবাসা এবং এদের সদালাপ, সদাচরণ, মানুষকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা–এ সবকিছু তারা করে থাকেন। কিন্তু এরা ঠিক দুনিয়াদারিতে আসেন না। রাষ্ট্রের কাজকর্ম কিংবা এ জাতীয় অন্যান্য কাজকর্মের মধ্যে তারা নিহিত হন না। কিন্তু আমাদের রসুল (স), যাঁকে আল্লাহ নেয়ামতস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন, জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তাঁর অংশগ্রহণ এবং অবদান রয়েছে। একজন স্বামী হিসেবে, একজন নেতা হিসেবে, একজন সত্যবাণী প্রচারক হিসেবে, একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে, একজন যোদ্ধা হিসেবে–এমন অনেকগুলো ভূমিকা তিনি পালন করেছেন মাত্র ৬৩ বছরের জীবদ্দশায়।

আপাতদৃষ্টিতে জীবনের পুরো সময়টাকে তিনি এমনভাবে ব্যয় করেছেন যে, তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্বের একটা সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। স্বয়ং স্রষ্টা পবিত্র কোরআনে তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, রসুলের মধ্যে মানবজাতির জন্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।

আরেকটা কথা এখানে বলা দরকার। কোরআন শরীফ কিন্তু শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়; বরং পুরো মানবজাতির জন্যেই। কোরআনকে বলা হয়েছে 'হুদাল্লিল নাস'–ফর দ্য হোল অব ম্যানকাইন্ড। এখন এটা কে নিল বা কে নিল না, সেটা বড় কথা নয়। এ ব্যাপারে কোরআনেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনোরকম জোরজবরদস্তি নেই। কেন? পরের কথাটা অসাধারণ, সেটা হলো–'কেননা সত্য অসত্য থেকে খুব স্পষ্ট'। তাই এখানে জোর করার প্রয়োজন নেই।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারি, ইসলাম হলো একটা ম্যানুয়াল। এই পৃথিবীতে পাঠানো মানুষের জন্যে, মানুষের সুন্দর জীবনের জন্যে একটা ম্যানুয়াল। অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে, নিজের ব্যাপারে কীভাবে কী করতে হবে, স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে অর্থাৎ সমস্ত নিয়মকানুন আর গাইডিং প্রিন্সিপলস এখানে বলে দেয়া আছে। এবং আমরা দেখি, রসুল (স) এ বিষয়গুলো তাঁর জীবনে প্রয়োগ করেছেন।

গতকালই আমি লামাতে বলছিলাম যে, আমরা যাকে রোল মডেল ঠিক করি, কিছুদিন পরেই দেখা যায়, তিনি আর রোল মডেল থাকেন না। কিন্তু আমাদের নবী করিম (স)-কে যে আদর্শ মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করা হলো, সেটা আজ থেকে ১৪০০ বছর আগের কথা। তার অনেক বছর পরে, ১৯৩৬ সালে সিঙ্গাপুরে বিশ্বখ্যাত লেখক ও নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ বলেছেন, আজকের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে যদি একজন মানুষ এসে পৃথিবীকে বদলে দিতে পারেন, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ (স)। একথার মানে কী? তিনি হচ্ছেন সর্বসময়ের সর্বকালের সব মানুষের নেতা। এখন কথা হলো, আমরা কীভাবে তাঁকে অনুসরণ করতে পারি?

আপনাদেরকে দেখছি–মানবতার দিক থেকে এবং সেবার দিক থেকে আপনারা যে কাজটা করছেন, এটা একটা অসাধারণ কাজ। কেবল নিজের সুখসুবিধার দিকে না তাকিয়ে মানুষের সুখসুবিধার কথা চিন্তা করছেন। কী করে মানুষ শান্তি পাবে, সেই পথ অন্বেষণের চেষ্টা করছেন। 'সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন' কথাটার মধ্যেই নিজের ও অন্যের জন্যে আপনাদের এ চাওয়াটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কেউ যদি শুধু নিজের সুখ অন্বেষণ করে বেড়ায়, তাহলে ওতে প্রকৃত সুখ নেই। বরং আমি যদি অন্যকে সুখী দেখতে চেষ্টা করি, তখন সুখ আপনিই আসে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গানে আমরা বলি, একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি–এটা একদম সত্যি কথা। আমাদের সবসময় প্রচেষ্টা হওয়া উচিত মানুষের সেবা করা। আল্লাহ তায়ালাও এভাবে একজন মানুষের দ্বারা আরেকজনকে সাহায্য করেন।

আমরা তো সবাই জানি যে, ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি–কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত। আমাদের অনেকেরই ধারণা, এই পাঁচটা জিনিস যদি আমরা আঁকড়ে ধরি, তাহলে বেহেশত আমাদের জন্যে একেবারে নিশ্চিত। কিন্তু কোরআনে কোথাও এমন কথা লেখা নেই যে, এই পাঁচটা জিনিস দিয়েই বেহেশতে যাওয়া যাবে। এর মধ্যে আবার কারো কারো ধারণা হলো, আমি

যদি একশ বছর বাঁচি তাহলে এ কাজগুলো করেছি কিনা, কিংবা আর কী করেছি, না করেছি, তা কীভাবে বোঝা যাবে? এই যে বলা হয়–কর্মফল বা আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, কিন্তু কীভাবে আমার এত এত সব কাজের আমলনামা রেকর্ড করা হবে?

আধুনিক বিজ্ঞানের নিত্যনব উদ্ভাবনগুলোর মাঝেই রয়েছে এর উত্তর। গত চার দশকে তথ্যপ্রযুক্তি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে! ছোট্ট একটা মাইক্রো-প্রসেসর, পৌনে এক সেন্টিমিটার থেকে শুরু করে দেড় সেন্টিমিটার পর্যন্ত জায়গা নেয়। এ জায়গার মধ্যে একজন মানুষের একশ বছরের সব কাজ, সব কথা, সব দৃশ্য অনায়াসে ধারণ করা সম্ভব। সুতরাং রেকর্ডিং নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। কারো মনে এ ব্যাপারে সন্দেহের প্রয়োজন নেই। এটা খুবই সম্ভব। অর্থাৎ পৃথিবীর কর্মফলের প্রেক্ষিতে বেহেশত-দোজখ নির্ধারিত হতে এখানে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আসল কথা হলো, যে যেই ধর্মেরই হোন না কেন, ভালো কাজ যদি না করা যায়, তবে স্বর্গ তার জন্যে নয়।

অনেকেই বলতে পারেন, আমার যদি বিত্ত না থাকে, সামর্থ্য না থাকে, তাহলে আমি কী করে ভালো কাজ করব? ভালো কাজ অনেকভাবে করা যায়। কোরআনে আছে, তুমি যা রোজগার করো, তোমার যে রিজিক–সেখান থেকে দাও। কেউ নগদ টাকা দিতে পারে, কেউ কিছু অন্ন দিতে পারে, কেউ বস্ত্র দিতে পারে, কেউ একটা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পারে, কেউ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে, আল্লাহ তাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন সেই জ্ঞান দিতে পারে। কষ্টক্লিষ্ট যে মানুষটি কোনো কূলকিনারা পাচ্ছে না, তাকে একটা পথ দেখিয়ে দিতে পারে। ভালো কাজের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। ভালো কাজ নানাভাবে করা যায়।

আর ভালো কাজ করতে গিয়ে যদি কাজ অসম্পূর্ণও থেকে যায়, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। সেই গল্পটা তো আপনারা সবাই জানেন। একজন বৃদ্ধ রাস্তায় হাঁটছিলেন, তার হাত থেকে লাঠি পড়ে গেছে। তা দেখে দুজন লোক এগিয়ে গেছে বৃদ্ধকে লাঠিটা তুলে দিতে। শেষমেশ কাজটা করতে পেরেছে একজন, আরেকজন পারে নি। স্বাভাবিকভাবেই সে মন খারাপ করেছে। তখন তাকে বলা হলো, যেহেতু তোমার নিয়ত ছিল কাজটা করার, সুতরাং তুমি না পারলেও একই রকম পুণ্য তোমার হবে। কারণ তুমি সেবা দিতে চেয়েছিলে। এটাই সবচেয়ে বড় কথা। আর ইসলামে এই দেয়ার কথাই বার বার বলা হয়েছে।

কোরআনে আছে, আল্লাহ তায়ালা রসুলকে বলছেন, 'ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কতটুকু দেবো? বলো, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছু।' এখন এই প্রয়োজনটা বুঝতে হবে। দেহের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট-এর মতো জীবনের অন্যান্য সবকিছুতেও প্রয়োজনের একটা সীমা আছে। তারপরও আমরা এর অতিরিক্ত যা করছি, সেগুলো সব মূলত সভ্যতার নামে অনুকরণ করছি। কখনো-বা এটা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা। কিন্তু মৌলিক প্রয়োজন আসলে খুব বেশি নয়। গান্ধীজী যেমন বলেছিলেন, There is enough in the world for everyones need, but not enough for everyones greed.

নবীজী (স) এ প্রয়োজনের সীমানাটার ব্যাপারে বার বার বলেছেন, নিজে চর্চা করেছেন। ওনার বাড়িতে এমন অনেক দিন গেছে, যখন ঘরে তেমন কিছুই নেই, এদিকে মেহমান এসেছে। তখন তিনি বলেছেন, সিরকা (ভিনেগার) থাকলে একটু রুটির সাথে সেটাই দাও। কিংবা সুরুয়াটা একটু বেশি করে করো।

এত অল্প দিয়ে নিজের আর পারিপার্শ্বিক প্রয়োজন পূরণ করেছেন বলেই তিনি একটা বড় সম্পদ রেখে যেতে পেরেছেন মানবজাতির জন্যে। সেটা কী? সেটা হলো একটা মহান সভ্যতা। এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কী হতে পারে? মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করলে নিজের সুখ হয়, অন্যের সুখ হয় এবং স্রষ্টা তার ওপর খুশি হন, সন্তুষ্ট থাকেন–তাঁর জীবনাচারের মধ্য দিয়ে সে জীবনদর্শন তিনি দেখিয়ে গেছেন।

এবার আসি তার ব্যক্তিচরিত্রের অন্যান্য গুণগুলোর ব্যাপারে। আপনাদের এখানে একটা কথা আমার ভালো লাগে–রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। রাগ-ক্রোধ, এটা হলো ষড়রিপুর মধ্যে একটা রিপু। কেউ বলতে পারবেন না যে, নবীজী (স) কখনো ক্রোধান্বিত হয়েছেন। রসুলের সহনশীলতার মাত্রা ছিল অনেক বেশি। সেটা যে কতটা, একটা ঘটনা বললেই তা বোঝা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে–*রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম/ ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।/ পথ ভাবে আমি দেব রথ ভাবে আমি,/ মূর্তি ভাবে আমি দেব–হাসে অন্তর্যামী*। অর্থাৎ সবাই নিজেকে দেবত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে বসে আছে, স্রষ্টার কথা কেউ চিন্তা করছে না। ওদিকে সব দেখে স্রষ্টা মুচকি হাসছেন। রসুল (স) যখন মক্কা জয় করে সেখানে প্রবেশ করলেন, স্থানীয় লোকজন সব ভয়ে বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে আছে, যদিও তিনি আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন–শিশুদেরকে হত্যা করবে না, বৃদ্ধদের হত্যা

করবে না, গাছ কাটবে না। অর্থাৎ বিনা কারণে কোনো রক্তপাত নয়। একপর্যায়ে তিনি কাবাঘরের ভেতর থেকে পাথরের মূর্তিগুলো বের করে আনার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ কাবাঘর তৈরিই করা হয়েছিল এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্যে। কিন্তু এর বাইরে মক্কার আর বাকি সব মূর্তি অক্ষতই ছিল। তিনি কাবাঘর থেকে মূর্তি নামাতে বললেন। কিন্তু কাবার যে গেটকিপার, তার কাছে ছিল এর চাবি। সে চাবি দেবে না।

একবার কল্পনা করুন, সাহাবাদের তখন কী অবস্থা! সবাই তো খুব রেগে গেলেন। রসুল তাদের নিবৃত্ত করলেন। তারপর তিনি নিজে গিয়ে গেটকিপারের পিঠে হাত রেখে শান্তস্বরে বললেন, তুমি চাবিটা দিয়ে দাও। তাঁর এমন কথায় আর প্রশান্ত আচরণে গেটকিপারের মনে কিছু একটা পরিবর্তন হলো। চাবিটা সে দিল বটে, কিন্তু ছুঁড়ে মারল। সাহাবারা তখন অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন, লোকটিকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। নবীজী বললেন, 'না, ওর কাজ ও করেছে'।

তারপর কাবার গেট খুলে মূর্তিগুলোকে বের করে আনা হলো, আবার ঘরে তালা দেয়া হলো। চাবি নিয়ে নবীজী ঐ লোকটিকে বললেন, তুমি আগেও কাবার রক্ষক ছিলে, এখনো তুমি তা-ই থাকবে। এই বলে তিনি আবার তাকে চাবি দিয়ে দিলেন। সে কিছুতেই এটা বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, কী শুনছি! সে নবীজীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল এবং বলল, এই যদি ইসলাম হয়, তাহলে আজ থেকে আমি ইসলামের মধ্যে এলাম।

এভাবে সারাজীবন বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন উপায়ে রসুল (স) সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা দেখিয়েছেন। এক অনন্য আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির প্রমাণ তিনি দেখিয়েছেন মদীনা সনদে। বড় বড় ইতিহাসবিদরা সবাই মদীনা সনদ সম্পর্কে বলেছেন, এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

মদীনা সনদের একটি ধারা আছে, যেখানে বলা হয়েছে, প্রত্যেক ধর্মের লোক নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে এবং কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না। খেয়াল রাখতে হবে, এটা কিন্তু সেই ১৪০০ বছর আগে তৈরি করা একটি সংবিধান, এসব বিষয়ের গুরুত্ব তখনো কেউ সেভাবে ভাবেই নি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কী অসাধারণ চিন্তা!

এটা তিনি কেন করতে পেরেছেন? কারণ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, সব মানুষ এক। তোমরা অন্যের ধর্মকে তিরস্কার করবে না, তাদের দেবদেবীকে তিরস্কার করবে না। সুতরাং অন্য ধর্মকে খারাপ বলা বা এ নিয়ে মন্দ কিছু বলা, এটা ইসলামে গর্হিত কাজ।

শুধু তা-ই নয়, যারা একেবারে ইসলামের ঘোরতর বিরোধী ছিল, মক্কা বিজয়ের পর রসুল তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। এবং বললেন যে, তারা নিশ্চিন্তে তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এরা তো সব এক স্রষ্টার সৃষ্টি। কে কোন ধর্ম পালন করছে, সে কী করে, তার মনে কী আছে, সেটা তো স্রষ্টা সবচেয়ে ভালো জানেন।

হাদীসের কথাটা এ-ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, তুমি সারারাত যদি নফল ইবাদত করো আর তোমার পড়শি যদি অভুক্ত থাকে, তাহলে সেই প্রার্থনা গ্রহণযোগ্য হবে না। এখানে কিন্তু ঐ লোকটির ধর্ম, গোত্র কিংবা কোনোরকম যোগ্যতার কথা বলা হয় নি যে, সে জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু, ক্রিশ্চিয়ান, ইহুদি নাকি মুসলমান। এমনকি সে হতে পারে অবিশ্বাসী। তবু তাকে দেখার দায়িত্ব আমার। কারণ সে আল্লাহর সৃষ্টি। অর্থাৎ এখানে কোনোরকম পার্থক্য করার সুযোগ নেই। স্রষ্টা কি তাঁর আলো বাতাস মাটি পানি এগুলো তার দিকে প্রবাহিত করেন, যিনি বিশ্বাস করেন এবং যিনি বিশ্বাস করেন না, তার দিকে অন্যভাবে প্রবাহিত করেন? না, তা-তো নয়।

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সৌরজগত সবকিছু মিলিয়ে মহাবিশ্ব পরিচালনায় যদি একটা এডমিনিস্ট্রেশনের কথা চিন্তা করি, তবে এতে কি এমন কোনো ব্যাপার আছে যে, সপ্তাহের একদিন একজন এডমিনিস্ট্রেটর এটা চালাচ্ছেন তো আরেকদিন চালাচ্ছেন অন্যজন? না, একজনই এই বিধি তৈরি করেছেন, একজনই এটা চালাচ্ছেন। কারণ সবকছুই এখানে একটা সুন্দর নিয়মানুসারে চলছে।

এখানে জগতশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদেরও বড়াই করার কিছু নেই। কারণ তারা না এলেও, তাদের বড় বড় উদ্ভাবনগুলো না করলেও মহাবিশ্ব এভাবেই চলত, স্রষ্টা যেভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা এই নিয়মগুলো তৈরি করেন নি, আবিষ্কার করেছেন মাত্র।

সৃষ্টির আদি থেকেই সবকিছু একটা সুন্দর গাণিতিক নিয়মানুসারে চলছে। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের এটা একটা অন্যতম ভিত্তি, যা আমাদেরকে এ বিষয়গুলো আরো ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। বিশ্বাস ছাড়া কোনো সৃষ্টিশীল কাজ হয় না। আর আমি যদি স্রষ্টাতে বিশ্বাস করি, তবে তাঁর সৃষ্টিকে আমার ভালবাসতে হবে, মানুষকে আমার ভালবাসতে হবে। কোরআনে এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলা হয়েছে, গোটা পৃথিবীর মানুষকে একটা সম্প্রদায় হিসেবে ভাবতে হবে। আমাদের রসুলুল্লাহ (স) ঠিক এই আইডিয়া নিয়ে তার যাবতীয় কাজগুলো করতেন। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি।

তাঁর সেক্রেটারিয়েট ছিল মসজিদে নববী। এখানে বসেই তিনি একদিন এক ক্রিশ্চিয়ান প্রতিনিধি দলের সাথে আলাপ করছিলেন। একপর্যায়ে ওরা বলল, আমরা কি একটু বিরতি নিতে পারি? রসুল বললেন, নিশ্চয়ই। তারা জিজ্ঞেস করল, আমাদেরকে কি একটু প্রার্থনার সময় দেবেন? রসুল বললেন, নিশ্চয়ই। এরপর তারা চার্চ কোথায় আছে, সেটি জানতে চাইলে রসুল বললেন, এই মসজিদে প্রার্থনা করতে আপনাদের কোনো অসুবিধা আছে? এটা শুনে তারা তো তাদের নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না! এটাই রসুলের শিক্ষা।

মানুষের মাঝে আলো জ্বালানোর কাজ হচ্ছে শিক্ষা। আমরা যদি দেখি, শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর কীরকম অবদান, অথচ তিনি নিজে উম্মি অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞানহীন ছিলেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে যত লোক পদচারণা করেছে, তার চেয়ে জ্ঞানী মানুষ আর নেই। স্বয়ং প্রভু ছিলেন তাঁর শিক্ষক। নবীজী (স) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক নরনারীর জন্যে অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ। আমি তো বলি, এই কথাটি সারা বাংলাদেশের সকল বাড়ির দরজায়, শহরে-বন্দরে-গ্রামে, সকল বাড়ির প্রবেশপথে লিখে রাখা দরকার। তাহলে অন্তত নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে এই দেশ মুক্তি পাবে। আর তাঁর এ কথার আলোকে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির ব্যাপারে কী অপূর্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি! কী সুন্দর উপায়ে মুক্তি দিলেন ওদের।

নবীজী (স) উপলব্ধি করেছিলেন–যে পড়তে পারে না, সে-তো আসলে চোখ থাকার পরও অন্ধ। 'চোখ থাকিতে অন্ধ' যাকে বলে। নবীজী সিদ্ধান্ত দিলেন– একজন বন্দিকে মুক্ত করা হবে, যদি সে ১০ জনকে অক্ষরজ্ঞান দান করে। অর্থাৎ মানুষকে অন্ধত্বের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে সে নিজে মুক্ত হলো। কী অসাধারণ প্রজ্ঞাপ্রসূত পরিকল্পনা! এভাবে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন শিক্ষা আর জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে।

জ্ঞান অর্জনের প্রতি রসুলের এমন গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি বর্তমান পৃথিবীর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। আজ পৃথিবীজুড়ে চলছে নলেজ ইকোনমির যুগ। জ্ঞানই আজ সবচেয়ে বড় কাঁচামাল। পৃথিবীর অনেক দেশ আছে, যাদের নিজেদের তেমন কোনো খনিজ সম্পদ নেই, কিন্তু সারা পৃথিবী থেকে বিভিন্ন কাঁচামাল কিনে নিয়ে নিজেদের জ্ঞান প্রয়োগ করে তারা সে-সব জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে তোলে। এ-ক্ষেত্রে জাপানের কথা উল্লেখযোগ্য।

একসময় আমার একজন সহকর্মী ছিলেন, যিনি সনাতনধর্মী। রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করতেন তিনি। তার বাড়িতে যেতাম। তার বাবার

সাথে নানান গল্প হতো। তিনি বলতেন, আমি বুঝি না মুসলমানদের রোগ হয় কেমন করে? আমি বলতাম, এর মানে? রোগ তো সবারই হতে পারে। তিনি বুঝিয়ে দিয়ে বলতেন, না, মুসলমানদের রোগ হওয়ার কথা না। কারণ যে ধর্মের রসুল বলেন যে, ক্ষুধা না লাগলে খেয়ো না, আর খাওয়ার সময় একটু ক্ষুধা থাকতেই উঠে পড়ো–সেই ধর্মের অনুসারীদের তো এমনিতেই অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকার কথা।

এখানে আরো একটা কথা বলা প্রয়োজন, অনেকে খাওয়ার সময় ঢক ঢক করে পানি পান করেন। এই যে খাওয়ার মধ্যে পানি পান করা, এটা খুব অবৈজ্ঞানিক কাজ। রসুল বলছেন, খাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে পানি পান করো। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এ ব্যাপারে কী বলে?

আমরা যখন খাওয়াদাওয়া করি, তখন লালা আসে এবং পুরো পরিপাকতন্ত্রেই তখন কিছু এনজাইম নিঃসরণ ঘটে। খাদ্যচূর্ণগুলোকে ছোট ছোট করে ভেঙে হজমে সহায়তা করার জন্যে এটি জরুরি। এ সময় আমরা যদি পানি পান করি, তবে এনজাইমগুলো ডাইল্যুটেড হয় এবং এর ঘনত্ব কমে যায়। ফলে এনজাইমের কার্যকারিতা কমে যায়। সেজন্যে বলা হয়েছে যে, খাওয়া শেষ করার কিছুক্ষণ পর পানি পান করো। এছাড়া পানি পান করার সময় নিঃশ্বাস পানিতে পড়া, সেটিও স্বাস্থ্যকর নয়।

রসুলের জীবনদর্শন ও তাঁর নির্দেশিত জীবনাচারে এমন আরো অনেক কিছুই আছে, আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যার উপকারী ভূমিকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেমন, বসে পেশাব করার কথা বলা হয়েছে হাদীসে, দাঁড়িয়ে নয়। আমার এক আত্মীয়, তার একটা অসুখ হলো, তার পেশাবের সাথে প্রোটিন বেরিয়ে যেত। বেশ কয়েকজন চিকিৎসক দেখানোর পরও কোনো সুরাহা হচ্ছিল না। পরে আরেকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাকে বললেন, যদি দাঁড়িয়ে পেশাব না করো তো ভালো, আর যদি তা করো তবে সেটি আর করবে না। কারণ দাঁড়িয়ে পেশাব করার সময় শরীর থেকে অতিরিক্ত প্রোটিন বেরিয়ে যায়।

আরেকটা ঘটনা এখানে বলা যেতে পারে। একজন সাহাবা এলেন রসুলের কাছে। বললেন, আমার একটা সন্তান হয়েছে। রসুল বললেন, খুব ভালো কথা। কিন্তু সন্তানের গায়ের রং কালো হয়েছে বলে সাহাবার মন খারাপ। রসুল জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি উট আছে? সাহাবা কিছুই বুঝতে পারছেন না যে, আমি বললাম আমার ছেলে কালো হয়েছে, মন খারাপ; কিন্তু রসুল উটের কথা জিজ্ঞেস করছেন! কী ব্যাপার?

যা-ই হোক, সাহাবা জানালেন তার উট আছে। রসুল জিজ্ঞেস করলেন, উটগুলোর রং কীরকম? সাহাবা বললেন, ধূসর বর্ণের। রসুল জিজ্ঞেস করলেন, সবগুলো উটই কি ধূসর বর্ণের? সাহাবা তখন চিন্তা করে বললেন, না, একটা উট আছে লালচে ধরনের। রসুল তখন জিজ্ঞেস করলেন, ধূসর বর্ণের উটগুলোর মধ্যে এই লালচে ধরনের উট কী করে এলো? তখন সাহাবা কিছুটা চিন্তা করে বললেন, হয়তো এমন হতে পারে যে, এর বংশগতির কোনো সুপ্ত বৈশিষ্ট্য অনেকদিন পরে প্রকাশ পেয়েছে। রসুল বললেন, উটের কোনো সুপ্ত বৈশিষ্ট্য যদি অনেকদিন পর প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাহলে মানুষের কোনো সুপ্ত বৈশিষ্ট্য কেন অনেকদিন পর প্রকাশ পাবে না?

আজকে হিউম্যান জেনেটিক্স তো একই কথা বলছে। সমস্ত প্রাণের গভীরে আছে ডিএনএ, যা হলো জীবনের মাস্টার মলিকিউল। ডিএনএ-তে জিন সিকোয়েন্সিং হওয়ার সময় কোনো একটা বৈশিষ্ট্য কয়েক প্রজন্ম ধরে সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। পরে সেটি প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু এ-তো আবিষ্কার হয়েছে মাত্র কিছুদিন আগে, এখনো একশ বছরও হয় নি। কিন্তু রসুল একথা বললেন সেই ১৪০০ বছর আগে।

লামায় গিয়ে দেখলাম, বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-গাছালি–সবমিলিয়ে পুরো জায়গাটা সুন্দর সবুজ হয়ে আছে। শুনলাম, আগে এরকম ছিল না। একসময় এর প্রায় সবই ছিল পোড়া পাহাড়। বহু কষ্ট করে, যত্ন করে গাছ লাগিয়ে এমন সবুজ করা হয়েছে। ফলে আজ নানা জাতের অনেক পাখিও সেখানে এসেছে। এটা খুব জরুরি।

ধরিত্রীকে সবুজ করার জন্যে এখন সারাদেশে, সারা পৃথিবীতে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কত মিটিং, সেমিনার। অথচ আমরা দেখি, রসুল সেই কবে বলেছিলেন, যদি নিশ্চিত জানো যে, আগামীকাল কেয়ামত হবে এবং তোমার হাতে যদি কোনো গাছের চারা থাকে, তবে তা রোপণ করো। কত বড় কথা! প্রথম কথা হচ্ছে, কখন কেয়ামত হবে, তা কেউ বলতে পারে না। তবু যদি কোনোভাবে এটা জানা যায়, তখন সবাই তো পরস্পরের কাছে মাফ চাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। সেখানে রসুল বলছেন চারা গাছ থাকলে তা যেন রোপণ করা হয়।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে এসে আপনারা ধ্যান করছেন, শান্তির কথা বলছেন। আজকের এই কোলাহলময় পৃথিবীতে ধ্যান খুব দরকার। সেইসাথে আপনারা শিক্ষার আলো জ্বালানোর, মানুষকে ইতিবাচকতায় উদ্বুদ্ধ করার কাজ করছেন। এর পাশাপাশি আমরা যেন রসুলকে, রসুলের জীবনাদর্শকে রোল

মডেল হিসেবে নিজেদের সামনে আনতে পারি, ইসলামের শিক্ষাকে সর্বতোভাবে অনুসরণ করতে পারি, যা সত্যিই আমাদেরকে একটি কল্যাণকর জীবনের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টার আয়োজিত বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্য, ২৮ জানুয়ারি ২০১২

কোনো মুসলমান সাম্প্রদায়িক হতে পারে না, সাম্প্রদায়িক লোক মুসলমান হতে পারে না

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আপনারা সবাই সকাল থেকে এখানে বসে ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে কোরআনের তেলাওয়াত শুনছেন, এজন্যে প্রথমেই আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

একটা বিষয় আমি টের পাচ্ছি–আমার বয়স যত বাড়ছে, আমার উপলব্ধির মাত্রাটাও তত বদলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমার জানার পরিধি এখনো খুব সীমিত। আমি অনেক কম জানি। দেখছি, জানার এখনো অনেক বেশি কিছু বাকি। আজ থেকে ৩০/৪০ বছর আগে এটা কখনো মনে হয় নি। তখন বরং মনে হতো, অনেক কিছুই জানি। তবে আমি আপনাদের এখানে সাহস নিয়েই কথা বলি। আনন্দ নিয়ে বলি। কারণ যেটুকু আমি বলি, সেটুকু আমার স্রষ্টার ওপর নির্ভর করেই বলি। এবং তিনি তাঁর সৃষ্টির মহত্ত্ব আমাকে যতটুকু প্রকাশ করতে সাহায্য করেন, ঠিক ততটুকুই আমি পারি।

আপনাদের কোরআন তেলাওয়াত শোনা দেখে আমার একটা ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথা মনে পড়ে গেল। সেটা বলি প্রথমে। হজে ও ওমরাহ-তে যতবার আমি মক্কায় গেছি, আমার সবসময় একটা আশা ছিল–সৃষ্টির জন্যে রহমতস্বরূপ আমাদের রসুল যে হেরা পাহাড়ের গুহায় ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন, যেখানে তাঁর ওপর কোরআন নাজিল করা হলো প্রথম, ওখানে কি একবারও আমি উঠতে পারব না? একবার আমার খুব জেদ হলো–আমি যাবই।

১৯৯৫ সালের কথা। সুদানে একটা কনফারেন্স ছিল। সেবার ওখান থেকে ফেরার সময় মক্কায় গিয়েছিলাম। আমি পাহাড়ে উঠতে চাইলে ওখানকার বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা বললেন, না যাওয়াই ভালো হবে স্যার। অতটা ওপরে ওঠা আপনার জন্যে কঠিন হতে পারে। কিন্তু আমি তো যাবই। একপর্যায়ে আমি শুনছি, ওরা পাশের ঘরে নিজেরা আলাপ করছে–স্যারের বয়স হয়েছে, উনি কি নিজেকে এখনো সেই আগের মতো তরুণ মনে

করেন? আর ওখানে একটা জায়গা আছে, যেখানে একবার ওপরে গিয়ে আবার নিচে নেমে আবার ওপরে উঠতে হয়। ঐ জায়গাটায় কোনোভাবে পিছলে গেলে কী হবে? আমি কিন্তু এদিকে সব শুনছি।

ওদের ডেকে বললাম, দেখ একটা কথা বলি–আমি ওখানে যাবই ইনশাল্লাহ। তোমরা যদি আমাকে সাহায্য করতে চাও তো একজন আমার সঙ্গে চলো, যেহেতু আগে গিয়েছ। তারা বুঝল, আমি নাছোড়বান্দা। তার পরদিন ঠিকই গেলাম। প্রায় দুঘণ্টা লাগল।

এখন যে-রকম দেখা যায়–রসুলের সময় তো আর এত কোলাহলময় ছিল না ওখানকার পরিবেশ। তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে ভাবতেন, এই সূর্যের স্রষ্টা কে? আকাশের স্রষ্টা কে? আমার স্রষ্টা কে? নিজেকে বার বার তিনি প্রশ্ন করতেন। ইব্রাহিম (আ) যেমন করেছিলেন–'কে আমার প্রভু?'। ওই পর্বত-গুহা থেকে রসুল মক্কার তৎকালীন জীবনের অসারতা পর্যবেক্ষণ করতেন। তখন একটা দোচালার মতো ছিল, তিনি দিনের পর দিন ওখানে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন।

আমি যখন ওখান থেকে ফিরে এলাম তখন অন্যেরা বলল, আজকে আপনি কোথাও যাবেন না। সারাদিন বিশ্রাম করুন। শরীরটা সত্যিই একটু ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। আমার তখন মনে হলো, এখন তো তা-ও পথ হয়েছে। কিন্তু রসুল (স) যখন হেরা-তে যেতেন তখন তো ওখানে কোনো পথ ছিল না। আর এ অবস্থাতেই বিবি খাদিজা (রা) প্রতিদিন খাবার নিয়ে যেতেন ওখানে। কত কষ্ট করেই না তিনি যেতেন এবং ফিরতেন। কই, তাদের তো কষ্ট মনে হতো না! ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো, এই যে মেহনত, দিস ইজ দ্য কী অব ইসলাম। ইসলামের একটা বড় চালিকাশক্তি হলো মেহনত। এই মেহনত বা পরিশ্রম বাদ দিয়ে কিছু হবে না।

আজ আপনাদেরকে এখানে দেখে সেই কথাটাই আমার মনে হচ্ছে। এই ছুটির দিনে অন্য অনেক কিছুতে বা ঘরে শুয়েবসে, বিশ্রামে সময় ব্যয় না করে আপনারা এখানে চুপচাপ বসে ধ্যানমগ্ন হয়ে কোরআন তেলাওয়াত শুনছেন। আপনারা একটা উত্তম কাজে মেহনত করছেন–স্রষ্টার বাণীকে জানার জন্যে, সর্বোপরি নিজেকে জানার জন্যে অর্থাৎ আত্ম উপলব্ধির জন্যে। এর পেছনে আসলে একটা শ্রম বা ত্যাগ না থাকলে হয় না।

আপনারা জানেন, কোরআন নাজিলের সময় ফেরেশতা প্রথমে পড়ে শোনালেন আমাদের রসুলকে। তারপরে ধীরে ধীরে একটু একটু করে পুরো কোরআন নাজিল হয়েছে এবং মানুষকে পাঠ করতে বলা হয়েছে। যখনই কোরআনের কোনো বাণী আসত, তখন নবীজী (স) সেটা মুখস্থ করে রাখার

চেষ্টা করতেন। আল্লাহ তায়ালা তখন বলেছেন যে, একে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমার। আপনি শুধু শুনুন।

এখানে যে শোনার কথা বলা হয়েছে, এটা কিন্তু কোরআনে আছে। নিমগ্ন হয়ে চুপ করে শোনা–মেডিটেটিভ স্টেট যাকে বলে। এখানে একটা বইয়ের রেফারেন্স দেয়া যেতে পারে–কেনেথ ওয়াকারের লেখা *ওনলি দ্য সাইলেন্ট হিয়ার*। যে চুপ করে থাকে, সে-ই শোনে। সে-ই বোঝে। এর মধ্যে বিজ্ঞানী হেইজেনবার্গের কথা আছে এবং অন্যান্য অনেকের কথা আছে।

এ বইটির লেখকের একটা অদ্ভুত উপলব্ধি হয়েছিল একটা বনের মধ্যে। তার মনে হয়েছিল, এই বনের মধ্যে কারা থাকে? তারা কী করে? কোনোদিন কী আমরা চিন্তা করে দেখেছি–একটা বিরাট জঙ্গল, এর মধ্যে কী কী আন্তঃক্রিয়া সংঘটিত হয়? কোন কোন প্রাণী থাকে এখানে? তারা কীভাবে কথা বলে? কীভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে? তিনি সেইসব ব্যাপারগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন খুব কাছ থেকে, খুব নীরবে। পরে এই কথাগুলোই তিনি লিখেছেন বইটিতে। এভাবেই নীরবে ধ্যানমগ্ন হয়ে তেলাওয়াতটা শুনতে হয়। কারণ এই যে কোরআন, এর মধ্যে জীবনের সবগুলো দিকই উল্লিখিত আছে চুম্বক আকারে।

প্রথমদিকে যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হতো তখন জোরে শব্দ করে করা যেত না। নবী করিম (স) হেরা থেকে এসে কোরআন নাজিলের কথা প্রথম বললেন বিবি খাদিজা (রা)-কে। বিবি খাদিজা এটি সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করলেন, বিশ্বাস করলেন তাঁর কথা এবং মুসলমান হলেন। তারপরে রসুল (স) যখন অন্যদের বললেন তখন কিন্তু তরুণরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, প্রবীণরা নয়। আমার ভালো লাগছে, আজ এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি তরুণরাই সংখ্যায় বেশি।

কেন সেদিন তরুণরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল সবার আগে? কারণ এর মধ্যে প্রচলিত সবকিছুর বিরুদ্ধে যে একটা বিদ্রোহ ছিল, বিদ্রোহের চেতনা ছিল, সেটা তরুণরা বুঝতে পেরেছিল। এই চেতনাটা তারা গ্রহণ করেছিল যে, সব মানুষ সমান। All Men and Women are equal in the eyes of the Lord. কারো ওপরে অত্যাচার করা যাবে না, কাউকে দমিয়ে রাখা যাবে না। কারো ওপর অবিচার করা যাবে না।

এই কথাগুলো সেদিনের আরবে সত্যিই একটা বিপ্লবের সূচনা করেছিল। যেখানে মেয়েদেরকে মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো না, সেখানে নারী-পুরুষ সবার অধিকারের কথা, সাম্যের কথা উচ্চারিত হচ্ছিল। পুরো সময়টাই ছিল

তখন একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়, যেখানে দাসত্ব ছিল, কোনো মুক্তি ছিল না। আর পদে পদে বিশৃঙ্খলা, অনাচার। যাকে বলা হয় আইয়ামে জাহেলিয়াত– দ্য পিরিয়ড অব ইগনোরেন্স।

সেই সময়ে রসুল আলো নিয়ে এলেন ওই অন্ধকার জনপদে। এ কারণেই কোরআনকে অভিহিত করা হয়েছে 'লাইট ফর গাইডেন্স' হিসেবে। আর আমাদের রসুলকে বলা হয়েছে 'সিরাজুম মুনিরা'। তিনি একটা আলো ছড়িয়েছেন। আলোকিত পথের সন্ধান দিয়েছেন মানুষকে। এই আলোকিত পথে কিন্তু প্রথম যারা এসেছিলেন, তাদের অধিকাংশেরই বয়স ছিল ২০-এর নিচে। আলী, ওমর–এঁরা সবাই ছিলেন বয়সে তরুণ। ঐ যে কবিতায় আছে, *এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময়*। ইসলামের প্রথমদিকে এটা খুবই সত্যি ছিল।

যারা তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সবরকম অন্যায় অবিচার শোষণ নিপীড়ন বঞ্চনা আর অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়ে একটা মর্যাদাপূর্ণ জীবনের কথা বলছে ইসলাম, যেখানে গোত্রবর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের জন্যে একটি অভিন্ন জীবনব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে। যেখানে সব মানুষকে সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেখানে মানুষকে ভালবাসার কথা বলা হয়েছে। সব মানুষের অধিকার সমুন্নত রাখার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

একটি সমাজে এর চাইতে বড় আর কী হতে পারে? সেজন্যে তারা ইসলামের সাম্যের বাণীকে গ্রহণ করেছিল। তবুও অনেক বাধা ছিল। তাই ধীরে ধীরে এগোতে হয়েছিল। এর মধ্যে অনেক যুদ্ধ করেছেন আমাদের রসুলে করিম (স)। কিন্তু যুদ্ধ চাপিয়ে না দেওয়া হলে তিনি যুদ্ধ করতেন না।

আবার সেই তেলাওয়াতের প্রসঙ্গে আসি। আপনারা সবাই জানেন যে, ওমর (রা) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এই তেলাওয়াতের মধ্য দিয়েই। তিনি সেদিন খুব ক্ষিপ্ত হয়ে বোনের বাসায় গিয়েছিলেন। গিয়ে শুনলেন, সুর করে কিছু পড়া হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন, কী পড়ছিলে? বোন তখন সূরা রাদ-এর কয়েকটি আয়াত পড়ে শোনালেন। সেই আয়াতে আল্লাহ বলেছেন বৃক্ষরাজির কথা, বৃক্ষরাজি সৃষ্টির কথা। এই তেলাওয়াত শোনার পর পরই ওমরের মনে বড় ধরনের একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো। তিনি দৌড়ে গেলেন নবীজীর কাছে। নবীজী (স) বললেন, আজ আমার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। তোমাকে আমি ইসলামের সেবক হিসেবে চেয়েছিলাম। তারপরের ঘটনা আমরা জানি যে, ওমর (রা) কীভাবে কাজ করেছিলেন সত্যের জন্যে।

কোরআন তেলাওয়াত শুনলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয় যে, এ যেন সত্যি এক মহাছন্দময় কবিতা। আমি একটা অংশ শুধু একটু পড়ে শোনাচ্ছি। সূরা গাশিয়ার কয়েকটি আয়াত–*আফালা ইয়ানজুরুনা ইলাল ইবিলি কাইফা খুলিকাত/ ওয়া ইলাছ সামা-ই কাইফা রুফিয়াত/ ওয়া ইলাল জিবালি কাইফা নুছিবাত/ ওয়া ইলাল আরদি কাইফা সুতিবাত*। এখানে এই যে খুলিকাত, রুফিয়াত, নুসিবাত, সুতিবাত–এ শব্দগুলোতে কী অপূর্ব ছন্দ!

এ সূরায় আল্লাহ উটের কথা উল্লেখ করেছেন। ইজরাইলের একজন বিজ্ঞানী এটা শুনে উটের ওপর একটা গবেষণা করেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহিমার বর্ণনা দিতে গিয়ে এত এত প্রাণী থাকতে কেন উটের কথা বলেছেন। সেই বিজ্ঞানী তার গবেষণায় দেখলেন, উটের নাকে একটা লম্বা ওয়ান ওয়ে মেমব্রেন বা একটা একমুখী পর্দা আছে, যা তার শরীরে ৬৮ শতাংশ পর্যন্ত জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে সাহায্য করে। আর এই প্রক্রিয়ায় উট তার শরীরকে শীতল রাখে। কারণ উট মরুভূমির প্রাণী, সেই মরুভূমির মধ্যেই একে বেঁচে থাকতে হয়। অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে কিন্তু এটা নেই।

সুতরাং এই ছোট ছোট বিষয়গুলো থেকেই বোঝা যায়, কোরআনে উল্লেখিত রেফারেন্সগুলোর গুরুত্ব। এ আয়াতগুলো পড়া এবং সাথে সাথে যত এগুলো নিয়ে আমরা চিন্তা করব, তত বিষয়গুলো আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। আমি নিজে এ আয়াতটা নিয়ে প্রায়শই চিন্তা করি। এ প্রসঙ্গে আমার একটা ঘটনা বলি।

একবার হজে গেছি। শুক্রবার জুম্মার নামাজ পড়তে গেলাম কাবা শরীফে। সেদিন মসজিদে বসে এই আয়াতটার কথাই আমি চিন্তা করছিলাম, যেখানে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মহিমা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। একসময় নামাজে দাঁড়ালাম, জামাত শুরু হলো। খতিব ঠিক এই সূরাটিই পড়লেন। মনে হলো, কী অদ্ভুত! এই আয়াতটির কথা আমি আজ চিন্তা করছি আর ঠিক তা-ই আজ পড়া হচ্ছে!

এর কদিন পর গেলাম মদিনায়। মদিনায়-ও একটা শুক্রবার পেলাম। যথারীতি জুম্মার নামাজে গেলাম। মজার ব্যাপার হলো, সেদিনও একই ঘটনা ঘটল। দ্বিতীয় রাকাতে ঠিক একই সূরা পড়া হলো। খুব ভালো লাগল আমার। ব্যাপারটা এতটাই আলোড়িত করল আমাকে–আল্লাহ যেন বলছেন, 'তুমি যে চিন্তা করছ, সেটা চালিয়ে যাও'। আমি জানি না কতটা সময় আমি পাব কিন্তু এই চিন্তা আমি চালিয়ে যেতে চাই।

কোরআনের সূরা আরাফ-এর একটি আয়াতে বলা হয়েছে, যখন

কোরআন পড়া হয় তখন মৌন থাকো এবং মন দিয়ে তা শোনো। এই যে মন দিয়ে শোনা, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে একটা মেডিটেটিভ স্তরের কথা বলা হয়েছে। আর কীভাবে পড়া হবে বা তেলাওয়াত করা হবে, তা নিয়েও একটা হাদীস আছে।

রসুল (স) একবার দেখলেন যে, আবু বকর (রা) খুব নিচু স্বরে, খুব আস্তে আস্তে কোরআন পড়ছেন। আরেকদিন ওমর (রা)-কে দেখলেন যে, তিনি বেশ জোরে জোরে পড়ছেন। পরে তিনি আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি এত আস্তে আস্তে পড়ছিলে? আবু বকর উত্তর দিলেন, আমি এটা অনুধাবন করে পড়ছিলাম। রসুল কিছু বললেন না।

এরপর ওমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত জোরে জোরে পড়ছিলে কেন? ওমর উত্তর দিলেন, যদি ঘুমিয়ে পড়ি সেই ভয়ে আমি খুব জোরে পড়ছিলাম। তারপর রসুল বললেন, অধিক জোরে পড়ো না। কারণ, হয়তো আশপাশে কেউ ঘুমাচ্ছে বা অন্য কোনো কাজে করছে। তাই খুব জোরেও না, আবার খুব আস্তেও নয়। মাঝামাঝি একটা জায়গা। অর্থাৎ ইসলাম হচ্ছে একটা মধ্যপন্থার ধর্ম।

আসলে কোরআন তেলাওয়াতের একটা মূর্চ্ছনা আছে। ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে শুনলে সেই মূর্চ্ছনাটা অনুভব করা যায়। তখন কোরআন আমাদের অন্তরে প্রবেশ করবে। এবং আমরা এই বাণী অনুধাবন করতে পারব।

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স প্লেন ছাড়ার আগে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে যে ঘোষণা দেয়, তাতে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বলে যে, 'ধ্যান্‌সে সুনো'। এই 'ধ্যান' মানে মনোযোগ। এই মনোযোগটা খুব জরুরি। আমাদের চারপাশে আজ সারা পৃথিবী জুড়েই একটা বিশৃঙ্খলা আর কোলাহল। এই নিরন্তর কোলাহলে মানুষ প্রায়শই নিজেকেই হারিয়ে ফেলে। আর মনোযোগ বা ধ্যান এই কোলাহলের মধ্যেও আপনার ভেতরে একটা আলাদা জগত তৈরি করতে সাহায্য করে–প্রশান্তির জগত, যেখানে কিছুক্ষণ থাকলে বাইরের এই কোলাহল আপনাকে প্রভাবিত করতে পারবে না।

আজকে অশান্ত পাশ্চাত্যের যে দশা, তার অন্যতম কারণ হলো, অগণিত বস্তু আর হাজারো কোলাহলের ভিড়ে নিজেদের ভেতরের এই প্রশান্তির জগতটাই তারা হারিয়ে ফেলেছে। চারপাশের অনেক কিছুই ওরা শোনে, কেবল সময় নেই নিজের অন্তরের কথা শোনার।

আমি দেখেছি, এই বিষয়টাই গুরুজী বিজ্ঞানসম্মতভাবে খুব সুন্দর উপায়ে উপস্থাপন করেছেন কোয়ান্টাম মেথডে, যার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যাতে

নিজের অন্তরের ধ্বনি শুনতে পায়। গুরুজী ধাপে ধাপে মনের বাড়িতে নিয়ে যান, সেখানে আপনি ধ্যানস্থ হন। চারপাশে সবকিছু আপনি অনুভব করেন। ঝর্নার জলধ্বনি বা সমুদ্রের জোয়ারের শব্দ আর নিবিড় প্রকৃতিকে অনুভব করেন। পাখির ডাক শোনেন। অন্তরটা তখন প্রশান্ত হয়। অন্তরের ধ্বনি শোনার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়ে উঠি। এই মেডিটেটিভ স্টেটকে ইসলামিক পরিভাষায় বলা হয় তাফাক্কুর। অর্থাৎ ফিকির করো, চিন্তা করো। নিমগ্ন হও।

আমি গুরুজীকে ধন্যবাদ জানাই যে, তিনি এই রমজান মাসে এমন একটা সমাবেশের আয়োজন করেছেন এই বিষয়গুলো বোঝার জন্যে। এটা সত্যিই এক অসাধারণ ব্যাপার। এতে আপনাদের আত্ম উপলব্ধি বাড়ছে। মানুষের জীবনকে সুন্দর করার জন্যে যে কোরআন আল্লাহ পাঠিয়েছেন, তাকে উপলব্ধি করার সুযোগ আপনাদের ঘটছে।

এর পাশাপাশি আপনারা যদি পরিবারে বাবা মা ভাই বোন স্বামী স্ত্রীসহ সবাই মিলে নিমগ্ন হয়ে কোরআন শুনতে পারেন, সেটাও একটা দারুণ ভালো কাজ হতে পারে। প্রথমে সবাই মিলে শুনলেন, তারপর সেটার ওপর আলোচনা করলেন। সন্তানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন। প্রতিবেশী কিংবা বন্ধু যে-ই আসতে চায়, তাকেও সাথে নিন, তিনি যে ধর্মেরই হোন। এতে আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়াও সহজ হবে।

আর এমনিতেও যে পরিবারে মা-বাবা-সন্তান একসাথে বসে আলোচনা করতে পারেন, সেখানে বন্ধুত্বপূর্ণ সহজ পরিবেশ বজায় থাকে। তাই এটা সবদিক থেকেই সমৃদ্ধ করবে আপনার পরিবারকে।

মানুষের জীবনকে সুন্দর আর সমৃদ্ধ করার জন্যেই তো কোরআন। আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করলেন কেন? মানুষ সৃষ্টি করার সময় ফেরেশতারা তো বলেছিল যে, এরা তো ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে পৃথিবীতে। আল্লাহ বলেছিলেন, 'আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না'।

একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আমি বলতে পারি, আল্লাহর এই যে এত সুন্দর সুন্দর সব সৃষ্টি, এগুলোর অবজার্ভার কোথায়? এর দর্শক কোথায়? দর্শক ছাড়া এটা সম্পূর্ণ নয়। এই যে নদী সুন্দরভাবে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, ঝর্নাধারা প্রবাহিত হচ্ছে, সমুদ্রের গর্জন, পাখি গান গাইছে সবিমিলিয়ে পৃথিবীর মধুর সব ধ্বনি আর দৃশ্য–চারপাশের এত ঘটনা কেউ যদি না দেখে, কেউ না শোনে, তবে কেমন করে হবে? একজন দর্শক এখানে দরকার, একজন শ্রোতা দরকার। বিজ্ঞানের জগতে যাকে বলে অবজার্ভার। এজন্যেই

মানুষকে। এখানে বলা যেতে পারে, আল্লাহ একজন দর্শক বা অবজার্ভার তৈরি করলেন। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি করলেন। কারণ এই ইউনিভার্সের জন্যে একজন দর্শক দরকার ছিল। এভাবেই আগমন ঘটল মানুষের–অসাধারণ মনোদৈহিক সিস্টেমসমৃদ্ধ এক অপূর্ব সৃষ্টির।

এখন পর্যন্ত এই হিউম্যান সিস্টেমের কতটুকুই-বা আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি? অনেকটাই পারি নি। বিভিন্ন সময় আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছি, আজকের পৃথিবীতে কোনটা সবচেয়ে উচ্চতর প্রযুক্তি–ন্যানো টেকনোলজি, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, ইনফরমেশন টেকনোলজির বিভিন্ন উদ্ভাবন, নাকি অন্য কিছু? একেকজন একেকটার কথা বলেন। কিন্তু আসলে এটা হচ্ছে হিউম্যান ব্রেন বা মানব মস্তিষ্ক। এটাই হচ্ছে জ্ঞানজগতের লেটেস্ট ফ্রন্টিয়ার। মানুষ আজ মহাশূন্যে চলে যাচ্ছে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, মানুষের চাইতে বড় বিস্ময় আর অপূর্ব সৃষ্টি আর কিছু নেই। আর এ বিষয়টা বুঝলে সেই মানুষ কখনো দুর্গতির মধ্যে থাকতে পারে না। সেই মানুষ মূর্খ থাকতে পারে না, হতাশাচ্ছন্ন থাকতে পারে না। এটা অনুধাবন করা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। আর এই কোরআন কার জন্যে? কোনো নির্দিষ্ট গোত্রের জন্যে নয়, বরং পুরো মানবজাতিকে সঠিক পথনির্দেশ করার জন্যে। এই বিষয়গুলো আমাদের গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করা চাই।

আর এর জন্যেই দরকার মেডিটেশন বা তাফাক্কুর। কোরআনে সূরা আলে ইমরানের ১৯০ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, যারা দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে এই দিবারাত্রির আবর্তন এবং আমার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে তারা বলে উঠবে, হে প্রভু! বিনা কারণে তুমি এসব সৃষ্টি করো নি।

এই আয়াতটি যদি ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে একটি বিষয় খুব ভালোভাবে বোঝা যেতে পারে–সেটি হলো ইকো-সিস্টেম, যাকে আমরা পরিবেশবিজ্ঞান বলি। পুরো পরিবেশবিজ্ঞান এই একটা কথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে যে, 'হে প্রভু! বিনা কারণে তুমি এসব সৃষ্টি করো নি।' একটা পিঁপড়া, একটা টিকটিকি, একটা শেয়াল, একটা গাধা কিংবা একটা রজনীগন্ধা–কোনো কিছুই কারণ ছাড়া সৃষ্টি করা হয় নি।

পৃথিবীতে সবমিলিয়ে প্রায় তিন কোটি প্রাণ। এর মধ্যে বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত মোটে ৫০ লাখ প্রাণ নিয়ে গবেষণা করতে পেরেছেন। এদের কেউই রিজিক বা জীবিকা ছাড়া নেই। এটা সত্যিই অদ্ভুত! কারো জীবিকা বাতাসে, কারো পানিতে, কারো মাটিতে, আবার কারো জীবিকা বৃক্ষে। জীবিকার জন্যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু রিজিক

ছাড়া কেউ নেই। জৈবিক পদ্ধতিতে প্রয়োজন অনুসারে এদের কোনো একটাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কিন্তু নিশ্চিহ্ন করতে পারেন না। একবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে পুরো সিস্টেমের কোনো একটা জায়গায় একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। একবার বাংলাদেশ সরকার মনে করল, চীনারা তো ব্যাঙ খায়, ব্যাঙের পা পছন্দ করে। এখন ব্যাঙ ধরো, রপ্তানি করো। ব্যাঙ তো কিছু পোকামাকড় ধরে খেত; কিছুদিন পর দেখা গেল, সেই পোকামাকড়গুলো অনেক বেড়ে গেল, যা বিভিন্ন ফসল যেমন শর্ষে ইত্যাদিতে মুখ বসাল–শর্ষে নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করল। তখন বোঝা গেল যে, এভাবে তো হবে না। ব্যাঙ রপ্তানি করা যাবে না। কারণ সামগ্রিক পরিবেশের ওপর ব্যাঙের একটা আলাদা ভূমিকা আছে।

একটা মাছরাঙা পাখি, সে ডাইভ দিয়ে পুকুর থেকে মাছ তুলে খায়। এখন প্রত্যেক ডাইভে যদি একটা করে মাছ ধরে ফেলতে পারত, তাহলে পুকুর মাছশূন্য হয়ে যেত। তা-তো হয় না। কখনো কখনো সে ব্যর্থ হয়। কারণ মাছও বাঁচার উপায় জানে, মাছেরও একটা বুদ্ধি আছে। আবার হরিণ ধরার জন্যে বাঘের যেমন বুদ্ধি আছে, তেমনি হরিণেরও বুদ্ধি আছে বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। এরা সবাই কিন্তু প্রকৃতিতে একসাথে আছে। সবাইকে নিয়ে অদ্ভুত একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশ। কারণ, প্রত্যেকেরই প্রত্যেককে দরকার।

যেমন, মৌমাছি আর ফুল। দুজনকেই দুজনের দরকার। যদি মৌমাছি ফুলের কাছে না যায়, তবে মৌমাছি মধু কোথায় পাবে আর ফুলের পরাগায়ন ও বংশবৃদ্ধিই বা হবে কীভাবে? সুতরাং দুজনেরই দুজনকে সমানভাবে দরকার। তাই মৌমাছি গিয়ে অপেক্ষা করে ফুল কবে প্রস্ফুটিত হবে, সে একটু মধু নেবে। সে তখন কী করে? ফুলের চারপাশে পাখা ঝাপটাতে থাকে। বার বার ভিখারির মতো ঘুরতে থাকে। সেটা দেখে ফুলের একটুখানি দয়া হয়। সে প্রস্ফুটিত হয়। দুজন দুজনের প্রয়োজন মেটায়। এই বিষয়টাই রবীন্দ্রনাথ তার গানে বলেছেন, *মৌমাছি ফিরে যাচে ফুলের দখিনা/ পাখায় বাজায় তার ভিখারীরও বীণা।*

এভাবেই টিকে আছে আমাদের প্রকৃতি, আমাদের ইকো-সিস্টেম। প্রকৃত শিক্ষার পাশাপাশি আমরা যত নিমগ্ন হতে পারব, চিন্তা করতে শিখব তত এ বিষয়গুলো আমরা বুঝতে সক্ষম হবো। আমরা বুঝলে আমাদের জীবন সমৃদ্ধ হবে। প্রকৃতি সমৃদ্ধ হবে। আমরা লাভ করব মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি।

আল্লাহ কোরআনে নিজের সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি যা বলেন, সত্য বলেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য, যা কখনো বিফলে যায় না।' আর তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মানুষ মন দিয়ে শুনলে এবং অনুসরণ করলে তার ওপর রহমত বর্ষিত হবে। আপনারা এই রমজানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো কোরআন শুনেছেন। আল্লাহ আপনাদের ওপর তাঁর রহমত বর্ষিত করুক।

আমি গুরুজীকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি সবকিছু সহজ ভাষায় ছোট ছোট বাক্যে বলেন, তেমনভাবেই লেখেন। খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবে গুরুজী কোরআন কণিকা সংকলন করেছেন। এর মোড়ক উন্মোচন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এরপর প্রকাশিত হয়েছে 'হে মানুষ শোনো!' এখানে সংকলিত ধর্মবাণীর মর্মার্থ যদি আমরা শুনি, আমাদের মধ্যে ভাবনার বিস্তার ঘটবে, আমরা অনুধাবন করতে পারব। কোরআনের শেষ সূরাটা হলো 'নাস'– যেখানে মানব সম্প্রদায় নিয়ে বলা হয়েছে, শুধু মুসলমান নিয়ে নয়। ধর্মবর্ণগোত্র নির্বিশেষে এই যে সমগ্র মানবজাতিকে একটি সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচনা করা, এটা ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। গত ৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমার মধ্যে এই চেতনাটা খুব প্রবল হয়েছে। আমি সবসময় বলি যে, শুধু বৈপরীত্যের কথা না বলে ইসলামের এই মৌলিক শিক্ষাটার কথা আমরা সবখানে বলি না কেন?

আমাদের বুঝতে হবে যে, সাম্প্রদায়িক বিভেদের কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। কোনো মুসলমান সাম্প্রদায়িক হতে পারে না, আর কোনো সাম্প্রদায়িক লোক মুসলমান হতে পারে না। আল্লাহ তাঁর জমিনের বহু অংশ আমাকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি খুব গর্বিত যে, আমাদের বাংলাদেশ একটা অসাম্প্রদায়িক দেশ। মানুষ এখানে মসজিদে, বাড়িতে, রাস্তায়, গাছতলায়, নৌকায়, গাড়িতে, হাটবাজারে নামাজ পড়ে। সবাই যে যার ধর্ম পালন করে স্বাধীনভাবে। এদেশের অধিকাংশ মানুষই ধার্মিক, ধর্মান্ধ নয়। আর আজ এখানে এই যে আপনারা বিভিন্ন ধর্মের এতজন মানুষ মেডিটেশনের মাধ্যমে ধর্মবাণী শুনছেন, স্রষ্টার বাণী অনুধাবন করছেন, গভীরভাবে চিন্তা করছেন স্রষ্টার সৃষ্টি নিয়ে; এটাই তো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা বড় উদাহরণ।

আমি এর আগেও এখানে একটা কথা বেশ কয়েকবারই বলেছি যে, আমাদের আরো মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই। কারণ এ দুয়ের উদ্দেশ্য একই–সত্যের অনুসন্ধান। কোরআনে বলা হয়েছে, রসুলকে পাঠানো হয়েছে সত্যসহকারে। সত্য হচ্ছে এর প্রাণ।

কোরআন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর সায়েন্সের কাজ কী? সায়েন্সের কাজও তো এটাই–সত্য আবিষ্কার করা। অর্থাৎ ধর্ম আর বিজ্ঞান–এ দুয়েরই মূল এজেন্ডা একই।

বিজ্ঞান বলে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে সমস্ত পদার্থ ও সমস্ত শক্তি একটা বিন্দুর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে একটা বৃহৎ বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের উৎপত্তি। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা মহাবিশ্বের সৃষ্টির পেছনে একই রকম ইঙ্গিত করেছেন। এছাড়াও দিবারাত্রির পরিবর্তন নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। এভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রাণীবিজ্ঞান প্রকৃতিবিজ্ঞান আবহাওয়া তত্ত্বসহ বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখার প্রসঙ্গই নানাভাবে উঠে এসেছে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে। এর সবগুলোতেই রয়েছে মহান স্রষ্টার অনন্য সব নিদর্শন।

অদ্ভুত ব্যাপার, আল্লাহ কোরআনে পানি ও জমিনের কথা বলেছেন মোট ৪৫ বার। এর মধ্যে পানির কথা উল্লেখ করেছেন ৩২ বার, আর জমিনের কথা ১৩ বার। এই অনুপাত অনুসারে অর্থাৎ শতকরা হিসেবে পৃথিবীর মোট পৃষ্ঠভাগের ৭১.১১১১ ভাগ পানি ও ২৮.৮৮৮৮ স্থলভাগ। বিজ্ঞানও তো একই কথাই বলে। পৃথিবীর জল ও স্থলভাগের এই যে অনুপাতের কথা আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন, তা এখন বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত অনুপাতের সঙ্গে চমৎকার সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা বিষয়গুলো পড়েছি ঠিকই, কিন্তু ভেবে দেখেছি কি? অথচ এসব বিষয় ঈঙ্গিত করেই তো আল্লাহ বার বার ভেবে দেখতে বলেছেন। শুধু পড়ে গেলেই হয় না, স্রষ্টাকে বুঝতে হলে এ বিষয়গুলো অনুধাবন করা চাই। আর এজন্যেই মেডিটেশন।

আমরা এসব বুঝি না, বুঝতে চাই না বলেই অনেকের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা যায়–একটুখানি বিজ্ঞান পড়েই মনে করে যে, আমি তো সবকিছুর ব্যাখ্যা করতে পারি। তাহলে মহাবিশ্বে স্রষ্টার স্থান আর কোথায়? স্রষ্টার আর কী ভূমিকা থাকতে পারে? এখানে কোনো দৈব ভূমিকা নেই। এদের ভাবখানা এমন যে, বিজ্ঞানের বিষয়টা যেন স্রষ্টার জন্যে একটা দুর্বল জায়গা। অথচ আমরা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারব যে, স্রষ্টার বাণী আর বিজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে একটা সুন্দর সাযুজ্য।

এখানে একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পরে। খ্যাতনামা মার্কিন চিকিৎসা-জিনবিজ্ঞানী ও বর্তমানে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ মেরিল্যান্ড-এর পরিচালক ফ্রান্সিস কলিন্স। তিনি সে দেশের 'হিউম্যান জিন প্রজেক্ট'-এর একজন নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানী। একসময় তিনি ছিলেন পুরোপুরি নাস্তিক। কিন্তু

মানব-জিন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তার মনে বিশ্বাস জন্মে। এ বিষয়ে তিনি একখানা বইও রচনা করেন–*দি ল্যাঙ্গুয়েজ অব গড : এ সাইন্টিস্ট প্রেজেন্টস এভিডেন্স ফর বিলিফ*। বইটা বেস্টসেলার-এর খ্যাতি পেয়েছিল।

বইটাতে তিনি লিখেছেন, কীভাবে তিনি বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। আসলে এ বিষয়গুলোর দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, 'এর পরও কি তারা ঈমান আনবে না?' কিন্তু কেউ কেউ একটু বিজ্ঞান পড়েই স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বসেন। এজন্যেই হয়তো প্রবাদ আছে যে, অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী।

স্রষ্টার কাছে একটাই প্রার্থনা–আমরা যেন এসব জ্ঞান বিশ্লেষণ করে সত্যিকারভাবে বুঝতে পারি, ভালোভাবে বুঝতে পারি। একবার যখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস জন্মাবে, আমরা ভেতর থেকে বলতে পারব, 'হে প্রভু, তুমি আমাদের কত কিছু দিয়েছ। আমরা অকৃতজ্ঞ ছিলাম, তাই বুঝি নি। আমাদের ক্ষমা করো। তোমার কল্যাণময় বাণী বোঝার সামর্থ্য আমাদের দাও। আমাদের জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করো। আমাদেরকে জ্ঞানে উজ্জীবিত করো। এবং সেই জ্ঞান দিয়ে তোমার সৃষ্টির কল্যাণ করার তৌফিক দাও।'

একবার যখন আমরা এটা বলতে পারব, তখন সত্যিকার অর্থেই আমাদের জীবন ধন্য হবে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্ত হতে পারব। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দিন।

পবিত্র রমজান মাসে কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন পরবর্তী আখেরি দোয়া অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্য, ২৭ আগস্ট ২০১২

আত্ম উন্নয়নের জন্যে চাই নিজেকে জানা

একজন মানুষ আত্ম উন্নয়নে আগ্রহী হলে তাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে নিজেই তার সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটাতে পারবে। যে দেহ-মন অর্থাৎ মনোদৈহিক সিস্টেম নিয়ে মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই সিস্টেমটাই তার আত্ম উন্নয়নের জন্যে যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। তাই অন্য কোনো সিস্টেমের কাছে তার ছুটে বেড়ানোর খুব একটা দরকার পড়ে না। আর মানুষের নিজের সিস্টেমের মাহাত্ম্য বলে শেষ করা যায় না। অপরিসীম এর শক্তি। অফুরন্ত এর সম্ভাবনা।

তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, সব মানুষ কেন আত্ম উন্নয়ন করতে পারছে না? এ প্রশ্নের উত্তর নানাভাবে দেয়া যেতে পারে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে উত্তরটি দেয়ার চেষ্টা করা যাক। একজন মানুষের কাছে একটি বাদ্যযন্ত্র আছে, সে মাঝেমাঝেই এর তারগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। 'টুং-টাং' শব্দ বেরোচ্ছে, কিন্তু সুর বেরোচ্ছে না। হঠাৎ অন্য একজনের চোখে পড়ল বাদ্যযন্ত্রটি। সে আনন্দে ছুটে এলো, আঙুল চালালো তারগুলোতে। অমনি বাদ্যযন্ত্রটি থেকে বেরিয়ে এলো অপূর্ব এক সুরের ঝঙ্কার। যে শুনল, সে-ই মোহিত হলো। যে বাজাল, সে-ও হারিয়ে গেল আরেক জগতে। এদিকে যার বাদ্যযন্ত্র সে ভাবল–হায় হায়, সারাজীবন আমি শুধু বাদ্যযন্ত্রটির মালিকই রয়ে গেলাম, এটা বয়ে বেড়ালাম; কিন্তু এর তারগুলোতে আঙুল চালানো শিখলাম না। একটা সুরও তো বের করতে পারলাম না এই যন্ত্র থেকে। অথচ কত সুরেলাই না হতে পারে এই যন্ত্র!

এ আক্ষেপ অনেকেরই। যন্ত্র বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সবাই, কিন্তু সে যন্ত্রের কোন তারে আঙুল কীভাবে চালালে কী সুর বের হবে, তা অনেকেই জানে না। মানুষের দেহ-মনও এমনি একটি যন্ত্র বা সিস্টেম। আরো ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এ যন্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আরো অনেক যন্ত্র। এক সিস্টেমের মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে আরো অনেক সিস্টেমের। এই

সিস্টেমটাকে ঠিকমতো ম্যানেজ করতে পারলে অর্থাৎ কোন অবস্থায় কীভাবে এটা সাড়া দেবে, সেটা জানতে পারলে এই সিস্টেমকে দিয়েই অকল্পনীয় অনেক কাজ করিয়ে নেয়া যায়।

আজ যারা মেডিটেশন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করছেন ও মানুষের সিস্টেমে এটা প্রয়োগ করছেন, তাদের উদ্দেশ্য একটাই–এই সিস্টেমকে জাগিয়ে তোলার পদ্ধতিটি ভালো করে বোঝা এবং দেহ ও মনের সমন্বয় সাধন করে আত্ম উন্নয়ন ঘটানো। এককথায়, বাদ্যযন্ত্রকে যেভাবে বাজানো দরকার, ঠিক তেমনি দরকার মানুষ নামক সিস্টেমকে 'টিউন' করতে পারা। আর মেডিটেশন এই 'টিউনিং'টা ঘটাতে সহায়তা করে। দেহ ও মনের মধ্যে একটা সুসমন্বয় ও সুন্দর অনুরণন ঘটাতে পারলে মানুষ তার নিজের সিস্টেমের সাহায্যেই অনেক কিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু এর জন্যে আগে এই সিস্টেমটিকে ভালো করে বুঝতে হবে।

দেহ-মন নিয়ে মানুষের যে সিস্টেম, তা বড়ই বিচিত্র এবং এখনো অনেকটা রহস্যময়। একই অঙ্গে কত যে রূপ, তা দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না। একটি সিস্টেম যে একইসাথে কতগুলো সিস্টেম হিসেবে কাজ করছে, তা অনেক মানুষ জীবনে একবার ভেবেও দেখে নি, বুঝতেও পারে নি। বিজ্ঞান এই ভেবে দেখা এবং বোঝার কাজটি অনেক সহজ করে দিয়েছে।

আমরা ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। দেশ-বিদেশের কত মনজুড়ানো ছবি তুলি। ক্যামেরা একটি অপটিক্যাল সিস্টেম (বিজ্ঞানের যে শাখা আলোক-বিজ্ঞানের কাজ ব্যাখ্যা করে, তাকেই বলা হয় অপটিক্স)। এখানে লেন্স আছে, অ্যাপারচার আছে, শাটার আছে, খুঁটিনাটি আরো অনেক কিছু আছে। কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি যে, মানুষ নিজেই একটি অপটিক্যাল সিস্টেম বয়ে বেড়াচ্ছে!

বস্তুত মানুষের চোখ একটি সুন্দর ক্যামেরা। এখানে চোখের রেটিনাতে বাস্তব ছবি (রিয়েল ইমেজ) তৈরি হয়–আমরা যে জিনিসের দিকে তাকাই, তার উল্টো ছবি তৈরি হয় রেটিনাতে, অপটিক নার্ভ ব্রেনে একটা সিগন্যাল পাঠিয়ে এই উল্টো ছবি সোজা করার ব্যবস্থা করে–কাজটি যে হয় তা আমরা জানি; কিন্তু কেমন করে হয়, সেটি এখনো রহস্যাবৃত। এই চোখ নামক ক্যামেরাকেই ইবনাল হাইসাম (যাকে বলা হয় ফাদার অব অপটিক্স) নাম দিয়েছিলেন 'ক্যামেরা অবস্কুরা'। চোখের কাজ বোঝার জন্যে তিনি মৃত মানুষের চোখ কাটতেন এবং তা নিয়ে গবেষণা করতেন।

ইবনাল হাইসাম-ই প্রথম বলেছিলেন, চোখ দেখতে 'আদাসা'র মতো। পরবর্তীতে ইবনাল হাইসামের কাজ নিয়ে পশ্চিমের গবেষকরা যখন চিন্তাভাবনা করলেন, তখন তারা বললেন, 'আদাসা' আবার কী! আদাসা একটি আরবি শব্দ–এর অর্থ হলো মসুরের ডাল। মসুরের ডালের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে লেন্টিকাম। পশ্চিমের বিজ্ঞানীরা তখন বুঝলেন যে, ইবনাল হাইসাম চোখকে মসুরের ডাল অর্থাৎ লেন্টিকামের সাথে তুলনা করেছেন। এই লেন্টিকাম থেকেই আজকের 'লেন্স' শব্দটির উৎপত্তি।

আমরা ক্যামেরার লেন্স নিয়ে মাথা ঘামাই, কিন্তু নিজের চোখের লেন্সের খবর রাখি না। কবি তো ঠিকই বলেন–*চোখের নজর কম হলে আর কাজল দিয়ে কী হবে...*। কিন্তু এ নজর কমে কেন? কী করলে দেখার কাজটি ভালোভাবে করা যায়, তা অবশ্যই পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। 'দেখা' যে আল্লাহর কত বড় একটা নেয়ামত, তা আমরা বুঝেও বুঝি না। তাই মানুষের দেহযন্ত্রের মধ্যে 'চোখ' নামক যে অপটিক্যাল সিস্টেমটি আছে, তাকে বুঝতে হবে এবং তার পরিচর্যা করতে হবে।

প্রকৌশলীদের কেউ কেউ, বিশেষ করে যারা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, তারা মেকানিক্যাল সিস্টেমের সব নিয়মকানুন বোঝেন। আমাদের মনুষ্য দেহটিও যে একটি মেকানিক্যাল সিস্টেম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা চাপকলে পানি তোলার সময় ভাল্‌ভের কাজ দেখি। সেই একই কাজ দেখি হৃৎপিণ্ড নামক পাম্পটিতে। এই হৃৎপিণ্ড-পাম্প থেকে রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে সারা দেহে–চারটি ভাল্‌ভের মাধ্যমে। আর এই ভাল্‌ভগুলো নষ্ট হয়ে গেলে বোঝা যায় সেই মারফতি গানের তাৎপর্য–*চাবি মাইরা দিছে ছাইড়া..*। এই চাবি একবার থেমে গেলে সমস্ত ভবলীলা সাঙ্গ।

তাই খাওয়াদাওয়া ও জীবনযাপন পদ্ধতি ঠিক রেখে এই হৃৎপিণ্ড নামক পাম্পটি যাতে কাজ চালিয়ে যেতে পারে, সে পরামর্শই দেয় চিকিৎসাবিজ্ঞান। এই পাম্প কাজ না করলে দেহ কাজ করে না। এভাবে হৃৎপিণ্ডসহ শরীরের অনেক অংশই মেকানিক্যাল সিস্টেম অনুসারে কাজ করে।

প্রকৌশল বিজ্ঞানে আমরা 'লিভার'-এর কথা বলি। ফালক্রামের ওপর রেখে যে দণ্ডের সাহায্যে ভার-উত্তোলন করা বা চাপ দেয়া হয়, তা-ই হচ্ছে লিভার। আমরা যখন কোনো জিনিস হাত দিয়ে টেনে তুলি, তখন সেটিও লিভারের কাজ করে।

তাছাড়া আমরা বস্তুর পীড়নের কথা বলি। অর্থাৎ বস্তুতে বল প্রয়োগ করে সেই বস্তুকে টেনে কতটা লম্বা করা যাবে (ইয়ংস মড্যুল্‌স এই পীড়নের একটি

নির্দেশক) বা কতটা মোচড়ানো যাবে (রিজিডিটি মড্যুল্‌স এ ধরনের পীড়নের একটি নির্দেশক) তার কথা বলি, কিন্তু আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে পীড়ন করে কত কাজই না করছি আমরা।

পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্ররা একটি স্টিলের তারের ইয়ংস মড্যুল্‌স মাপে, হুইলে মাছ ধরার সুতো কেনার সময় সেই সুতোর ব্রেকিং লোড জেনে নেয়–বেশি ওজনের মাছ যেন সুতো ছিঁড়ে ফেলতে না পারে। অথচ আমরা ২০/৩০ কেজি ওজনের জিনিস টেনে তুলছি, কিন্তু আমাদের শরীরের হাড় ও পেশির সংযোগকারী টিস্যু কোলাজেন টেন্ডন-এর ইয়ংস মড্যুল্‌স কত, সে খবর আমরা রাখি না। একজন মানুষ বিশেষভাবে স্পিরিটেড হয়ে তার চুল দিয়ে একটা গাড়ি পর্যন্ত টেনে নিতে পারে। আমাদের শরীর যে একটা মেকানিক্যাল সিস্টেম, তখন কি আমরা তা ভেবে দেখি?

আমাদের শরীর একইসাথে একটি কেমিক্যাল বা রাসায়নিক সিস্টেমও বটে। আমরা কত উপাদেয় খাবারই না খাই–বিরিয়ানি, মোরগ মোসাল্লাম, চপ, কাটলেট কত কী! আজকাল অনেকেই অবশ্য সচেতন হয়েছেন–রেড মিট অর্থাৎ গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির গোশত কম খাচ্ছেন। তবুও আমরা যা-ই খাই না কেন, শরীরের খাবার কিন্তু ঠিক তা নয়। শরীরের খাবার অন্য ধরনের, সেটা গ্লুকোজ। আমরা যা খাই, শরীর নির্দিষ্ট কিছু এনজাইমের সাহায্যে তা ভেঙে ফেলে। প্রোটিন থেকে যে এমাইনো এসিড পাওয়া যায়, সেগুলো দিয়ে শরীর আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শরীরের উপযোগী প্রোটিন ও অন্যান্য উপাদান তৈরি করে–কত ধরনের উপাদান কীভাবে যে তৈরি করে, তা ভেবে দেখলেও বিস্মিত হতে হয়। শরীর নামক সিস্টেমটি কী এক রাসায়নিক কারখানা!

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মায়ের স্তনে শিশুর জন্যে দুধ তৈরি হয় যে প্রক্রিয়ায়, তা যে-কোনো কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিকেও হার মানায়। কাগজ তৈরির কারখানা যারা দেখেছেন, তারা জানেন, কারখানার একপাশে দেখা যাচ্ছে বাঁশের টুকরো বা আখের ছোবড়া আর অপর প্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসছে সাদা কাগজ। এখানে একটা রাসায়নিক ফ্লো-শিট আছে। অর্থাৎ কোনটার পর কোনটা ঘটবে তা বলা আছে এবং সেই মতো যন্ত্র সেট করা আছে। কিন্তু আমরা আমাদের শরীরকে কখনো অর্ডার বা হুকুম দিচ্ছি না যে, তুমি এখন এটা করো, ওটা করো। অথচ শরীর তার কাজগুলো করে চলেছে সুন্দর একটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে। এই রাসায়নিক সিস্টেম একটি ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমও বটে।

এখন ব্রেনের ফাংশন বা কাজ বুঝতে গিয়ে জানা গেছে, নার্ভ সেল যে সিগনাল পাঠায়, তা মূলত একটি ইলেকট্রিক্যাল বা বৈদ্যুতিক পাল্‌স। ওদিকে হার্টের ডাক্তার যখন একজন রোগীর হার্টের ইসিজি (ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম) দেখেন, তখন এই ইসিজিতে যে জিনিসটি ওপরে-নিচে ওঠানামা করতে দেখা যায়; সেটি আর কিছু নয়, একটি ইলেকট্রিক ভোল্টেজ প্রকারান্তরে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশির কোষগুলোর তৎপরতার একটা নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের আরো অনেক তৎপরতাই শরীরকে একটি সুষ্ঠু ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম হিসেবে চিহ্নিত করে।

শরীর আবার একটি একস্‌টিক (শ্রুতিবিজ্ঞান) সিস্টেমও বটে। যে পদ্ধতিতে শব্দ আমাদের কানের ভেতরে গিয়ে ড্রাম ও অন্যান্য অংশকে সক্রিয় করে শব্দ শোনার অনুভূতি সৃষ্টি করে, তা একটি জটিল গাণিতিক বিষয়। তবে কেবল এটুকু বোঝা-ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট যে, আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ কম্পনসংখ্যার শব্দ শুনতে পায়।

আগেই বলেছি, শরীর মহাশয় সিস্টেমের মধ্যে সিস্টেম হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি কাজের জন্যে যে তাপ এবং শক্তি আমাদের দরকার, তা আমরা পাই খাবার থেকে–খাবার এখানে জ্বালানি হিসাবে কাজ করে এবং শরীর কাজ করে একটা থার্মোডায়নামিক সিস্টেম হিসেবে।

শরীর একটি জৈব ইঞ্জিন। ইঞ্জিন নানা কারণে বিকল হতে পারে। বাইরে থেকে শত্রুরা তা আক্রমণ করতে পারে এবং তা করছেও। তবে এসব শত্রু এত ক্ষুদ্র যে, তাদেরকে খালি চোখে দেখা যায় না। শত্রুগুলোকে (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাংগাস ইত্যাদি) এককথায় মাইক্রো-অর্গানিজম বা অণুজীব বলা যেতে পারে। সব অণুজীবই যে শত্রু, তা নয়। বস্তুত অনেক অণুজীব আছে, যা আমাদের অস্তিত্বের জন্যে অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু আমাদেরকে আক্রমণ করে অসুখবিসুখ ঘটায়–এমন অনেক অণুজীবও আছে। সেগুলোকে আমরা বলি প্যাথোজেনিক।

তবে বিস্ময়ের কথা হচ্ছে এই যে, এসব শত্রুর বিরুদ্ধে শরীর নামক সিস্টেমটি একটি ডিফেন্স সিস্টেম বা আত্মরক্ষামূলক সিস্টেম (ইমিউন সিস্টেম) হিসেবে কাজ করে। লক্ষ-কোটি ইমিউন সেল বা সৈনিক কোষ শরীরের বিভিন্ন অংশে এইসব অণুজীবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। শরীরের পুষ্টি ঠিক থাকলে, সবকিছু স্বাভাবিক থাকলে এসব সৈনিকরাই জয়ী হয়। শত্রুরা শরীর আক্রমণ করে, এমনকি সারাক্ষণ শরীরে বাস করেও কিছুই করতে পারে না। কোনো কারণে শরীরের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা যদি দুর্বল হয়ে পড়ে,

তখন এই অণুজীবরা যুদ্ধে জয়ী হয়। তখন তাদেরকে ঘায়েল করার জন্যে দরকার হয় ওষুধের। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওষুধ শরীরের কোষগুলোকে সাহায্য করে শত্রু নিধন করার কাজে। নিরাময়ের আসল কাজটা করে শরীর নিজেই। ওষুধ-পথ্য শরীরকে সাহায্য করে মাত্র।

শরীর যে একটা রণক্ষেত্র, এখানে যে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ চলছে এবং সে যুদ্ধে শরীর মহাশয় একটা জোরদার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা ডিফেন্স সিস্টেম হিসেবে কাজ করছে, সে খবর কজনই বা রাখি আমরা! রাখলে শরীরের সমাদর হয়তো আরো কিছুটা বাড়ত।

সবশেষে বলতে হয় কম্পিউটার সিস্টেমের কথা। আধুনিক কম্পিউটারের বিবর্তন ঘটেছে গত চার দশক ধরে। ১৯৪৮ সালে ট্রানজিস্টর আবিষ্কার হওয়ার পর আজকের কম্পিউটারের মেমোরি বাড়ছে। গতি বাড়ছে। কিন্তু মানুষ তার নিজ দেহের মধ্যে যে কম্পিউটার সিস্টেম বয়ে নিয়ে চলেছে, তার তুলনা হয় না। দেহটিকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্যে যা-কিছু কাজ, তার জন্যে কমান্ড বা আদেশ আসছে শরীরের কেন্দ্রীয় প্রসেসিং ইউনিট অর্থাৎ ব্রেন থেকে। সাধারণ কম্পিউটারে যেমন পাঁচ ভোল্টের একটি বৈদ্যুতিক পাল্‌সের সাহায্যে সুইচ অন করা যায়, এই ভোল্টেজ অন/ অফ করে সাংকেতিক ভাষা সৃষ্টি করা যায় এবং তার সাহায্যে সব হিসাবনিকাশ করা যায়, ঠিক তেমনি ব্রেনও কাজ করে বৈদ্যুতিক প্রবাহের দ্বারা।

প্রত্যেক নার্ভ সেল একটি ভোল্টেজ উৎপন্ন করে এবং পরবর্তী নার্ভ সেল-এ একটি বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠায়। এই সংকেত সেকেন্ডে ৩৯৩ ফুট ভ্রমণ করে। সুতরাং শরীরের প্রতিক্রিয়াগুলো বেশ দ্রুতই বলতে হবে।

সাধারণ কম্পিউটারের মতো ব্রেনেরও মেমোরি আছে, যা অনেকদিন তথ্য ধরে রাখতে পারে। তবে মানব মস্তিষ্কের অভিনবত্বটা একটা উদাহরণ দিলে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ডিএনএ নামক বংশগতির নীলনকশা হিসেবে পরিচিত জৈব মলিকিউল বা অণুতে অনেক তথ্য লুকিয়ে আছে। ডিএনএ-এর গঠনে আছে এডিনিন (A), থাইমিন (T), গুয়ানিন (G) ও সাইটোসিন (C) নামক রাসায়নিক পদার্থ। আরো রয়েছে সুগার ও ফসফেট। এগুলো দুটি প্যাঁচানো সিঁড়ির আকারে জীবকোষে সংগঠিত। সিঁড়ির একপাশে এডিনিন থাকলে অন্যপাশে থাকবে থাইমিন এবং একপাশে গুয়ানিন থাকলে অন্যদিকে সাইটোসিন থাকবেই। এগুলোকে বলা হয় নিউক্লিওটাইডস।

একটি জিন হলো ডিএনএ অণুরই অংশবিশেষ। মানুষের এক একটা ডিএনএ-র মধ্যে অনেক হাজার জিন রয়েছে। আমাদের সব তৎপরতার

জন্যে–যেমন : আমাদের চোখের রং কেমন হবে, বুদ্ধি কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়ের জন্যে এক বা একাধিক জিন দায়ী। কোষ বিভাজনের আগে ডিএনএ ঠিক নিজের মতো একটি প্রতিকৃতি তৈরি করে নেয়। প্রজননের মাধ্যমে বাবা-মার কাছ থেকে সন্তান লাভ করে বিভিন্ন ধরনের জিন। এএএ, এসিটি, সিজিজি ইত্যাদি ক্রমিকে সাজানো তিনটি করে নিউক্লিওটাইড একেকটি কোড বা সংকেত সৃষ্টি করে। এই সংকেতের ওপর নির্ভর করেই শরীরের রাসায়নিক, বৈদ্যুতিকসহ সব ধরনের তৎপরতা চলতে থাকে।

আধুনিক অজৈব কম্পিউটারের সাথে মনুষ্য জৈব কম্পিউটারের তফাতটা হলো এই যে, অজৈব কম্পিউটারকে বাইরে থেকে কমান্ড দিতে হয় এবং কখন থামতে হবে, তা বলে দিতে হয়। থামানোর জন্যে বাইরের বৈদ্যুতিক সুইচটি অফ করে দিলেই হলো। জৈব কম্পিউটারকে বাইরে থেকে কোনো সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম দিতে হয় না। দরকারি সব প্রোগ্রাম ওর ভেতরেই আছে–কখন একটা কাজ আর করতে হবে না, সে নির্দেশও ওর ভেতরেই ইন-বিল্ট বা প্রোথিত আছে। এখানেই জৈব কম্পিউটারের শ্রেষ্ঠত্ব।

তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, মানুষের দেহের মধ্যে যে নানা সিস্টেমের সমাহার, যেমন : মেকানিক্যাল সিস্টেম, অপটিক্যাল সিস্টেম, একস্‌টিক সিস্টেম, ইলেক্ট্রিক্যাল সিস্টেম, কেমিক্যাল সিস্টেম, থার্মোডায়নামিক সিস্টেম, ডিফেন্স সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার সিস্টেম ইত্যাদি নিয়ে সে নিজেই এক মহা-সিস্টেম।

এই মহা-সিস্টেমের অধিকারী মানুষ নামক প্রাণী তার জীবনে ও চলার পথে বিভিন্ন সংকটের সম্মুখীন হয়। অথচ শক্তিধর মানুষ সে সংকটের মোকাবেলা করতে পারছে না–এটা কেমন কথা! এতগুলো যন্ত্রকে একসাথে চালানোর জন্যে যে জিনিসটির প্রয়োজন হয়, তা হলো মনের শক্তি। এ শক্তি যে কত বিশাল হতে পারে, তা ভাষা দিয়ে বোঝানো সত্যিই দুঃসাধ্য।

ইনক্রেডিবল হাল্‌ক টিভি সিরিজটি যারা দেখেছেন, তারা হয়তো কল্পনা করেন যে, মানুষের মহা-সিস্টেমটি কী দুঃসাধ্য সাধনই না করতে পারে! ইচ্ছাশক্তির জোরে শরীরের অঙ্গসমূহকে একদিকে যেমন তৎপর ও গতিশীল করা যায়, তেমনি প্রয়োজনে আবার নিস্তেজ করার প্রক্রিয়াও আছে। কোনটা আমি দেখব, কোনটা দেখব না, কোনটা আমি শুনব আর কোনটা শুনব না, কোনটা আমি মনে রাখব আর কোনটা মনে রাখব না, তা আমার ইচ্ছাশক্তির ওপর নির্ভর করে। যদি শরীর নামক সিস্টেমের মধ্যে সিস্টেমগুলোর কার্যপদ্ধতি বোঝা যায়, যদি সেগুলোকে সচল ও কার্যকর রাখা যায়, তাহলে

সেগুলোর রেজোনেন্স বা অনুরণন ঘটিয়ে মানুষ কী না করতে পারে!

ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্য মস্তিষ্ক বা তার কমান্ড স্ট্রাকচারকে কত কার্যকর করতে পারে, তার ভুরি ভুরি উদাহরণ মানব সভ্যতার ইতিহাসেই রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে একথা অকপটে স্বীকার করতে হয় যে, যন্ত্রের অধিকারী হওয়াই যথেষ্ট নয়, যন্ত্রকে সঠিকভাবে বাজাতে হবে। বাজাতে জানতে হবে। আর কোন সুর আমি এই যন্ত্রে বাঁধব তা বলে দেবে আমার মন। আজকের বিশ্বদর্শন তাই অনেকটাই মনকেন্দ্রিক।

হাজারো সমস্যাপীড়িত এই গ্রহে যদি একটু স্বস্তি আর শান্তি পেতে চায় মানুষ, তবে তাকে শিখতে হবে তার সিস্টেমগুলোকে কখন সচল রাখবে, আর কখনই বা নিস্তেজ রাখবে। এক্ষেত্রে মনোশক্তির ওপর থাকতে হবে তার অগাধ বিশ্বাস। আমরা ব্রেন ও মস্তিষ্কের কাজ সামান্য বুঝেছি, বুঝে স্তম্ভিত হয়েছি, কিন্তু বোঝার অনেক কিছুই বাকি রয়ে গেছে।

গত কয়েক দশক মাইক্রো-ইলেক্ট্রনিকস ও কম্পিউটার বিপ্লবের ফলে মানুষের পক্ষে মহাশূন্যে পাড়ি দেয়া ও মহাশূন্যের খবর নেয়া সহজ হচ্ছে। যে মানুষ একদিন রাতের আকাশ দেখে বিস্মিত হয়েছে, সমুদ্রের বিস্তৃতি যাকে করেছে মুগ্ধ, সে মানুষই আজ তার মস্তিষ্কের জোরে পাড়ি জমাতে চাচ্ছে মহাশূন্যের প্রান্তসীমায়–জ্ঞানের সর্বশেষ ফ্রন্টিয়ার খোঁজার আশায়। কিন্তু মানব-স্রষ্টা অলক্ষে হাসছেন। হয়তো বলছেন, 'হায়রে মানুষ! জ্ঞানের যে সর্বশেষ ফ্রন্টিয়ার তুমি খুঁজছ, তা-তো তুমি নিজেই বয়ে বেড়াচ্ছ! আমি তো তোমার ব্রেনেই তা রেখে দিয়েছি।'

আজ এই ব্রেনের রহস্য জানার জন্যে মানুষ আগ্রহী। যন্ত্রী আজ মন ও চেতনার সাহায্যে তার যন্ত্রকে বাগে আনতে চায়। আজ মনের শক্তি নিয়ে যারা গবেষণা করছেন, মানুষের নিত্যদিনের সমস্যাকে যারা মনের শক্তি দিয়ে জয় করার সাধনায় রত, তাদেরকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হয়।

ধ্যানের মাধ্যমে বস্তুকে অতিক্রম করে, ইচ্ছার প্রাবল্যে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার সাধনা প্রাচ্যের মানুষ বহুদিন ধরেই করে আসছে। আজ পশ্চিমের কর্মকোলাহলরত মানুষেরাও এই সাধনায় মগ্ন হতে চাচ্ছে। এ পদ্ধতি জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে নয়; বরং জীবনকে সহজ ও সুন্দর করার জন্যে। মনে রাখতে হবে, আমরা বিশ্বপ্রকৃতির অংশ। প্রকৃতি নীরবে সচল থাকে, নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমরাও কোলাহলে নয়, ধ্যানের নীরবতায় খুঁজে পেতে পারি সচল ও সবল থাকার কৌশল। এই কৌশলই আমাদেরকে তুলে দিতে পারে আত্ম উন্নয়নের প্রকৃত পথে।

মন নিয়ন্ত্রণের বিশ্বজনীন প্রক্রিয়া কোয়ান্টাম মেথড

আমার খুব ভালো লাগছে যে, এখানে উপবিষ্ট সবাই আমার মতো পঞ্চাশোর্ধ্ব নন। আমি দেখছি অধিকাংশই তরুণ-তরুণী। এতে আমার মনে আশার সঞ্চার হচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, আজকের জগত কনজ্যুমারিজমের জগত। বস্তুর প্রতি সীমাহীন চাহিদা নানাভাবে আমাদের মনের শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছে। কাম্যবস্তুটি না পেলে আমরা আশাহত হচ্ছি। অশান্তিতে ভুগছি। এক অন্তহীন চাহিদার ফলে মানুষ আজ ক্রমাগত অশান্তি ভোগ করছে।

আমার এটা নাই, ওটা নাই–এ দুঃসহ অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে একটা অনুশীলন আমি তরুণ সমাজকে করতে বলব। সেটি হচ্ছে, ভেবে দেখ যে, কতগুলো জিনিস না হলেও আমরা চলতে পারি।

বাস্তব ব্যাপারটি হলো, মানুষের ভালোভাবে বাঁচার জন্যে, একটি মানবশিশুর শরীর ও মস্তিষ্কের সুষম বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় যে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট মিনারেল ভিটামিন-এর দরকার–আমাদের দুঃখ আমরা তো সবাইকে এটুকুই দিতে পারি না।

মানুষের জন্মের পর থেকে দুবছর/ আড়াই বছর ধরে ব্রেন সেল অর্থাৎ নিউরোন তৈরি হয়, তারপরে এভাবে আর নতুন ব্রেন সেল তৈরি হয় না। সুতরাং আমাদের শিশুদেরকে প্রয়োজনীয় এ জিনিসগুলোই সর্বাগ্রে দেয়া প্রয়োজন। আর পরবর্তীতে তো একটা বয়সের পর এটা খেয়ো না, ওটা খেয়ো না ইত্যাদি বিধিনিষেধ শুরু হয়। সুতরাং বাঁচার জন্যে, উন্নত চিন্তাশক্তির জন্যে এবং সর্বোপরি ভালো মানুষ হওয়ার জন্যে খুব বেশি কিছুর দরকার হয় না। বরং কোয়ালিটি অব লাইফ নির্ভর করে বস্তু কিংবা বাহুল্য জিনিসপত্র কত কমাতে পারেন, তার ওপর।

এ কথাগুলো বলছি এজন্যে যে, কনজ্যুমারিজমের এ যুগে আপনি যদি আপনাকে ঠিক রাখতে চান আপনার মনন ও মনস্তত্ব দিয়ে, তবে যতই

কর্মব্যস্ত থাকুন না কেন, আপনি একটি পদ্ধতি বেছে নিন। যে পদ্ধতিতে আপনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। কোয়ান্টাম মেথড আমাদের এই পদ্ধতিটি শেখায়।

কোয়ান্টাম মেথড বইটি আমি পড়েছি। শিথিলায়ন ক্যাসেটটিও শুনেছি। আমি দেখেছি, পদার্থবিজ্ঞানের অনেক বিষয় সহজ ভাষায় এখানে উঠে এসেছে। আমি পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র। এ বইটিতে পদার্থবিজ্ঞানী এরউইন শ্রডিঞ্জারসহ অনেকের অনেক কথা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই আলোচনায় এসেছে। কার্ল সাগানের পুলিৎজার-জয়ী *দি ড্রাগন্‌স অব ইডেন* বইটির কথা এসেছে। মলিকিউলার বায়োলজিস্ট ফ্রান্সিস ক্রিক-এর *অব মলিকিউল্‌স এন্ড মেন* আর নিউরোফিজিওলজিস্ট স্যার জন একল্‌স-এর কথাও বলা হয়েছে কোয়ান্টাম মেথড বইটিতে। পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী ইউজিন উইগনার-এর উদ্ধৃতিও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে চমৎকারভাবে।

এদের অনেকের সঙ্গেই বিভিন্ন কনফারেন্সে আমার দেখা হয়েছে, আলাপ-আলোচনা হয়েছে। বিজ্ঞানী ওয়ার্নার হেইজেনবার্গ-এর সম্পর্কে কিছু কথা আপনাদের বলব। তিনি এবং পল ডিরাক দুজনেই পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন। ২৬ বছর আগে ইতালির ট্রিয়েস্টে-তে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স-এর বিল্ডিংয়ে এরা দুজন পাশাপাশি বসে গল্প করছিলেন। আমি ঐ সেন্টারের এসোসিয়েট মেম্বার। সেদিন এরা দুজন পাশাপাশি বসে শিশুর মতো কৌতূহল নিয়ে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করছেন, 'আচ্ছা, কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে এই যে আমরা এত কথাবার্তা বলছি, আলোচনা করছি, আমাদের ব্রেনের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নিউরোনগুলোতে কি এই মেকানিক্স কাজ করে?' 'জানি না তো, হয় কিনা...', উত্তরে আরেকজন বললেন। ২৬ বছর আগের কথা। ঐ কনফারেন্সে তাদের ঠিক পেছনের সারিতেই আমি বসেছিলাম। ভাবতে অবাক লাগে–এত খোলা মনে, এমন শিশুর মতো সহজসরল কথা নোবেল পুরষ্কার বিজয়ীরা কীভাবে বলেন! সত্যিই এটা বিস্ময়ের ব্যাপার।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স হচ্ছে মূলত ছোট জিনিসের মেকানিক্স। বড় জিনিস যে নিয়মে চলে, ছোট জিনিস সে নিয়মে চলে না। আমি যদি এখান থেকে একটা বল ছুড়ে মারি এবং যদি জানি যে, কোন বলবিধিতে এটি কাজ করবে, যেমন : মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, তাহলে বলটির মাস্ বা ভর যদি M_1 হয়, পৃথিবীর ভর যদি M_2 হয় এবং তাদের মধ্যে দূরত্বটাও জানি, তাহলে মাধ্যাকর্ষণ বল বা Force = $M_1 \times M_2$ / দূরত্বের বর্গ। এই বলবিধিটি জানলে ঘড়ি ধরে

বলে দেয়া সম্ভব যে, যদি আমি একটি নির্দিষ্ট গতিতে বলটি ছুড়ি, তবে এক মিনিট পর বলটি কোথায় থাকবে।

ঠিক একই নিয়মে যদি স্যাটেলাইট ছুড়ি, সেটি কোথায় আছে তা বলে দেয়া যায়। এই হিসাব জানলে চাঁদ কখন কোথায় আছে, তা-ও বলে দেয়া সম্ভব। আমাদের এখানে চাঁদ দেখা নিয়ে অযথা অনেক তর্কবিতর্ক ও সমস্যার সৃষ্টি হয়। অথচ এটি হচ্ছে ডিটারমিনিস্টিক মেকানিক্স। বড় জিনিসের বেলায় Laws of the Large আর ছোট জিনিসের বেলায় Laws of the Small প্রযোজ্য। এই Laws of the Small-ই হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স। ছোট ছোট ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার বেলাতেই এটি কাজ করে। আর Laws of the Large-কে নিউটনিয়ান মেকানিক্সও বলে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ক্ষুদ্র কণার ওপর মাপজোক করতে গেলে তাকে ডিস্টার্ব করা হয়। এই মেকানিক্স ডিটারমিনিস্টিক নয় অর্থাৎ আগে থেকে সবকিছু হিসাব বা পরিমাপ করে এখানে বলে দেয়া যায় না। Laws of the Small-এ গিয়ে নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, একটি কণা কোন পজিশনে থাকবে। তবে ওখানে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু, সেটা বলা যেতে পারে।

এখন ব্রেন সেল বা নিউরোন সম্পর্কে আমি কিছু বলব। Billions of Neurons! জড় জগতের যে নিয়ম, সেই নিয়মে জীবজগতকে পুরোপুরি বুঝে ওঠা কিংবা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। এজন্যে জীবজগতের অনেক কিছুই আমাদের কাছে এখনো রহস্যময় রয়ে গেছে।

অব মলিকিউল্‌স এন্ড মেন বইটিতে স্যার ফ্রান্সিস ক্রিক বলেছেন, অবশ্যই রসায়নশাস্ত্র এবং পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে 'মেকানিস্টিক ভিউজ অব ইউনিভার্স'-এর সমস্যা ব্যাখ্যা করতে হবে। আবার অনেকে বলেন, এই মন বা চেতনা (Consciousness) তো নিউরোনের খেলা। ব্রেনের নিউরোনে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন আছে। প্রোটিনগুলো নিউক্লিক এসিড দিয়ে তৈরি। নিউক্লিক এসিডগুলো হলো কতগুলো কম্পাউন্ড। ঐ কম্পাউন্ডগুলো আবার কতগুলো মলিকিউল দিয়ে তৈরি। মূলত নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন ফসফরাস কার্বন অক্সিজেন–এ ধরনের উপাদান সেখানে আছে।

যখন আমরা চিন্তা করি তখন এই মলিকিউলগুলো কী করে? They are dancing around অর্থাৎ তারা স্থান পরিবর্তন করে। The human brain is really like a nonlinear oscillator. এই মানবমস্তিষ্ক আসলে একটি অরৈখিক বিদ্যুৎবাহিত পেন্ডুলামের মতো কিংবা ঐ ধরনের একটি বস্তু। Linear oscillator হচ্ছে একটি রৈখিক পেন্ডুলামের মতো জিনিস, যা দেখে

আপনি বলে দিতে পারবেন–কোন জিনিস কখন যাচ্ছে, কখন ফিরবে–যদি টাইম পিরিয়ড জানেন। Nonlinear oscillator-এর ক্ষেত্রে হিসাব করে এরকমটা বলা সম্ভব নয়।

অনেকেই চেতনাকে একটি মলিকিউলার তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চান। কিন্তু এটা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। সমস্যাটা কোথায়? আমি যখন পঞ্চাশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসির ছাত্র ছিলাম, সমস্যাটা বোঝার জন্যে সেখানে বিস্তর বই ঘেঁটেছি। আমি একসময় সলিড স্টেট ফিজিক্স-এর একজন নামকরা লেখকের বই খুব পড়তাম। তার নাম রবার্ট সেইজ। ১৯৮৮ সালে লস এঞ্জেলস-এ আমি তাকে প্রথম দেখি। ওখানে তিনি 'ফিজিক্স ভিউ অব লিভিং সিস্টেম' সম্পর্কে বলছিলেন। প্রথমেই তিনি যা বললেন সেটি হলো একটি বিখ্যাত ছড়া, যা আপনারা সবাই জানেন :

Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses and all the king's men
Couldn't put Humpty Dumpty together again.

আসলে হাম্পটি ডাম্পটি কী? ওটা ছিল একটি ডিম। ডিম আসলে কী? ডিম হলো একটি সিঙ্গেল সেল অর্গানিজম বা এককোষী জীব। ওটা পড়ে গেল, তারপর ভেঙেও গেল। রাজার সৈন্যদের দোষটা কী ছিল? তারা ডিমের ছড়িয়ে পড়া অংশগুলো জোড়া দিয়ে ডিমটিকে পুনরুদ্ধার করতে পারল না।

এই ছড়াটি আজকের দিনের মলিকিউলার বায়োলজি বোঝার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু ছড়ার জন্যেই ছড়া নয়। যদি ওই ডিম একটা মাত্র কোষ দিয়ে তৈরি হয়, তাহলে ওর মধ্যে একটা নিউক্লিয়াসও আছে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে অনেক কিছুই আছে, যেমন : মাইটোকন্ড্রিয়া ইত্যাদি।

মনে করুন, আপনি খুব ভালো করে ওই কোষের প্রতিটি উপাদান সম্পর্কে জানেন। আপনি তার একটা তালিকা করুন। দেখুন, সেল মেমব্রেন বা কোষ আবরণী কী দিয়ে তৈরি? ওর ভেতরে কী কী আছে? তা-ও জানলেন বা দেখলেন। তারপর নিউক্লিয়াস। এভাবে প্রত্যেকটি জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে নিন। তারপর একসময় এমন ক্ষমতাও আপনি অর্জন করলেন যে, ওই উপাদানগুলোকে আপনি তৈরি করতে পারবেন। যদিও বিজ্ঞান এখনো সেটা সম্ভব করতে পারে নি।

আমরা কেবল ল্যাবরেটরিতে একটা ডিএনএ সংশ্লেষণ করার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু শুধু ডিএনএ-ই জীবন নয়। যদিও এককভাবে ডিএনএ-ই

হলো মাস্টার মলিকিউল অব লাইফ। আপনি একটি কোষের প্রত্যেকটি জিনিস অর্থাৎ হাম্পটি ডাম্পটির প্রত্যেকটি জিনিসের তালিকা করলেন। এবং মনে করলেন যে, এটি আমি তৈরি করার জ্ঞান রাখি। আপনি জিনিসগুলো তৈরি করলেন একটা ফ্যাক্টরিতে। তারপর এসেম্বলিং করলেন। যেখানে যে জিনিসটি সেট করা দরকার, তা করলেন। ডিমটি পুনরায় সেই আগের আকৃতিই ধারণ করল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, তবুও সেটা হাম্পটি ডাম্পটি হলো না। অর্থাৎ এটি কোনো জীবন্ত কোষ হলো না।

যেমন, একটি লাঠি কীভাবে তৈরি হয়, তা আপনি জানেন। একটি লোহার রড দিয়ে লাঠি আপনি সহজেই তৈরি করতে পারেন। ইচ্ছে হলে গলাতে পারেন, কাটতে পারেন। অর্থাৎ একটা রডকে দুভাগে ভাগ করে এবং পরে জোড়া দিয়ে 'হোল ইকুয়াল টু সাম অব দি পার্টস'–এটা প্রমাণ করতে পারেন। কিন্তু সেই হাম্পটি ডাম্পটির ক্ষেত্রে এটি খাটল না, এখানে দরকার আরো কিছু। That is the Elixir of Life. যাকে খুঁজে পাওয়ার পথে যে রহস্য, তার কোনো শেষ নেই।

মোদ্দাকথা, আমরা যেটি বলার চেষ্টা করছি–পদার্থবিদ আর রসায়নবিদরা যত চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলছি, তারপরও আমাদের একটা জিনিস লক্ষ করতে হয়–তা হচ্ছে, The reduction approach of life dosen't simply work, it works for mechanical objects. একটি ঘড়ির সমস্ত পার্টস আর তার কার্যপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে যদি আপনি জানেন, তবে এগুলো আলাদা আলাদা করে আপনি আবার সব জোড়াও দিতে পারবেন। এই যে সব পার্টস খুলে আলাদা আলাদা করে ফেলা, এটাই রিডাকশন মেথড। এ পদ্ধতিতে আপনি সবগুলো পার্টস খুলে ফেলুন, তারপর আবার প্রত্যেক অংশ পরস্পরের সাথে যুক্ত করুন, জোড়া দিন। এরপর চাবি ঘুরিয়ে দিন। ঘড়ি চলবে।

কিন্তু এই রিডাকশন মেথড আবার বায়োলজিতে কাজ করে না। নিউরোনের কথাই বলি। নিউরোন সম্বন্ধে কোয়ান্টাম মেথড বইয়ে বলা হয়েছে। এখানে সিন্যাপ্স-এর কথা বলা হয়েছে। যে সিস্টেমের কথা আমরা বলছি, We never ordered for it.

কাপড় সেলাই করতে গিয়ে অনেকেই বার বার দর্জির কাছে যান। জামার কলার ঠিক হয় নি, বোতাম জায়গামতো লাগানো হয় নি, এটা হয় নি, সেটা হয় নি ইত্যাদি। এভাবে কয়েকবার দেখেশুনে অর্ডার দিয়েও কাপড় পছন্দমতো হয় না অনেকসময়। কিন্তু আমাদের সিস্টেম ট্রায়াল ছাড়াই দিব্যি চলে। কোনো ট্রায়াল এখানে দেয়া হয় নি। You never ordered for it.

ব্রেন চালাতে ২৫ ওয়াট বিদ্যুৎ লাগে। অর্থাৎ আপনার পুরো সিস্টেম একটা ব্যাটারির মতোই কাজ করছে। Did you ever order for it? আপনি খাবার খাচ্ছেন, কীভাবে কী করছেন, না করছেন–আপনি আপনার সিস্টেমকে কোনোদিন একটা হুকুম-হাকাম করেছেন? নাকি বলতে হয়েছে– তুই এই সিস্টেমে হজম করবি, ওটা এভাবে করবি। না, তা-তো করেন নি।

এই যে সিস্টেম, এর সব জিনিস একটা সুন্দর নিয়মে কাজ করছে, এগুলো যদি Pure Mechanical Object বা নিরেট বস্তু হতো, তাহলে না হয় আপনি বলতেন–ঠিক আছে, খোলো, ভেঙে টুকরো টুকরো করো, আবার আগের মতো জোড়া লাগিয়ে তৈরি করো ওটাকে। তারপর ঠিক আগের মতোই যে ওটা চলল, Living object-এর বেলায় কিন্তু তা নয়।

টিভিতে আমরা দেখি, একজন মানুষ তার চুল দিয়ে একটা গাড়ি উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যদি বলা হয় যে, সে শুধু তার চুলের স্থিতিস্থাপকতা দিয়ে এটি করছে বা করতে পারছে, তবে তা ঠিক হবে না। কারণ, সেখানে মননেরও একটা ব্যাপার আছে। *ইনক্রেডিবল হাল্‌ক* নামে একটা টিভি সিরিয়ালের কথা মনে আছে না? এই ইনক্রেডিবল হাল্‌ক কিন্তু যখন তখন হওয়া যায় না। তার একটা প্রস্তুতি লাগে।

কল্পনা করুন তো, যদি আপনার বুড়ো আঙুলটি না থাকত, তবে কী হতো? আপনি এই বুড়ো আঙুল ছাড়া কোনোভাবেই চলতে পারবেন না। বায়োলজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে এরকম অনেক জিনিস আছে। যেমন : হার্ট। এই হার্ট-এ আছে পাম্পিং সিস্টেম। নিজে একবার কল্পনা করুন–এই পাম্পটি কীরকম! এটি কীভাবে চলছে? হার্টের একটি চেম্বার থেকে আরেকটি চেম্বারে কীভাবে রক্ত আসছে যাচ্ছে। একটি বন্ধ হচ্ছে তো আরেকটি খুলে যাচ্ছে। আমি কোনো সময় অর্ডার করলাম না, অথচ আমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এর কী দায়! কী দারুণ প্রচেষ্টা!

আমরা এখন চিকিৎসাসেবার বিভাগগুলো বা এর বিশেষায়িত দিকগুলো সম্বন্ধে মোটামুটি ভালোই বুঝি, জানি। যেমন : দাঁতের চিকিৎসার জন্যে ডেন্টিস্টের কাছে যাই। চোখের চিকিৎসায় চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ, হার্টের রোগে হার্টের ডাক্তারের কাছে যাই। অর্থাৎ একেকজন চিকিৎসক শরীরের একেকটি অংশ দেখছেন, সেই অংশের চিকিৎসা দিচ্ছেন। কিন্তু 'মি. বডি' যদি এভাবে শরীরের একটি অংশই কেবল দেখত, একদিকেই শুধু মনোযোগ দিত, তাহলে এতকিছু হতো না, আমাদের পুরো বায়োলজিক্যাল সিস্টেম এত সুন্দরভাবে চলত না, যথাযথভাবে কাজ করতে পারত না।

এখানেই অ্যালোপ্যাথি বা মডার্ন মেডিসিন ও হারবাল মেডিসিনের একটা পার্থক্য আমরা দেখি। হারবাল মেডিসিনের একটা বড় সুবিধা হলো, এখানে কোনো উপাদানকে আলাদা করা হয় না। এখানে সব সক্রিয় উপাদানগুলো একসাথে থাকে। সুতরাং কোনো সক্রিয় উপাদান যদি কোনো একটা টিস্যুর ওপর প্রতিক্রিয়া করে বসে, তবে তা হয় অত্যন্ত ক্ষতিকর। আর সব রাসায়নিক উপাদানেরই শরীরের ওপর কমবেশি প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কারণ আপনি যখন ওষুধ খাচ্ছেন, তখন আপনি প্রকারান্তরে গ্রহণ করছেন কিছু রাসায়নিক উপাদান। এটি প্রকৃতি থেকে কিংবা কৃত্রিমভাবে প্রস্তুতকৃত। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে আপনার শরীরে কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়াও ঘটছে।

আরেকটা বিষয় জানা চাই, মানবদেহ প্রতিমুহূর্তে কেমিক্যাল সিস্টেম, মেকানিক্যাল সিস্টেম, ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমের মধ্য দিয়ে চালিত হচ্ছে; এককভাবে কোনো একটি পদ্ধতিতে নয়। তাই আমরা বলতে পারি, হিউম্যান সিস্টেম হলো একটা সিস্টেম অব সিস্টেম্‌স।

আমাদের গ্রামগঞ্জের হাটে-মাঠে যে চিরায়ত মারফতি গানগুলো হয়, ওই গানগুলো আমার কাছে খুব ভালো লাগে। একেকসময় মনে হয় যে, তারা জীবনের একেবারে ভেতরের বিষয়গুলো বুঝে গেছে। যেমন : *একটা চাবি মাইরা দিছে ছাইড়া..*। আসলে এটা তো সত্যি যে, আপনার হার্টে দম দেয়াই আছে। যদি কারো এ যন্ত্রটি থামিয়ে দেয়া হয়, তাহলে কী হবে? জানাজা পড়তে হবে বা শেষকৃত্যের আয়োজন করতে হবে।

অর্থাৎ এই যে সিস্টেম, এর মধ্যে ঢোকার এবং একে বোঝার প্রয়োজন আছে আমাদের। তার অর্থ এই নয় যে, আপনাকে আমি কোনো এক্সট্রা সেনসরি ওয়ার্ল্ড-এ নিয়ে যাচ্ছি বা আপনাকে দুনিয়ার কাজকর্ম ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি। আপনাকে আপনার সিস্টেমটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে। যত ভালোভাবে এটা বুঝতে পারবেন তত ছোট ও বড় উপাদানের অন্তর্গঠনের ব্যাপ্তি সম্পর্কে বুঝতে পারবেন। আর এটি যত ভালোভাবে বোঝা যাবে, মৌলিক কণাগুলোর সম্পর্কেও তত ভালোভাবে বোঝা যাবে। আমাদের পুরো সিস্টেমকে মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে বা আণুবীক্ষণিক স্তরে বুঝতে পারাও তখন সহজ হবে।

একসময় গ্রিকরা বলত, 'দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ কম্পোজড অব কম্পাউন্ডস।' এসব কম্পাউন্ডসকে কতগুলো বেসিক এলিমেন্টস বা মৌলিক উপাদান বলত ওরা। যেমন : পানি, আগুন, মাটি ও বাতাস। পরে বিজ্ঞানীরা বললেন, এগুলোও মৌলিক উপাদান নয়। কতগুলো যৌগ বা কম্পাউন্ডসই হলো

মৌলিক উপাদান। তারপরে তারা বললেন, কম্পাউন্ডস বা যৌগগুলোও মৌলিক উপাদান নয়। এগুলো আসলে অন্য কতগুলো উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। ৯২টি উপাদান, যেমন : হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, হিলিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত। এর মধ্যে ইউরেনিয়াম এত ভারী যে, এর একটি বল তুলতে আপনি হিমশিম খাবেন।

পরে দেখা গেল, এই ৯২টি উপাদানও সেই মৌলিক উপাদান নয়। এগুলো আবার কিছু মলিকিউলস দিয়ে তৈরি। অর্থাৎ এরও মলিকিউলস আছে। যেমন : দুটো হাইড্রোজেন এটম একসঙ্গে করে একটি হাইড্রোজেন মলিকিউল তৈরি হয়। আর এটম হচ্ছে সোলার সিস্টেমের মতো। ভেতরে নিউক্লিয়াস আর বাইরে চারপাশে ইলেক্ট্রনগুলো ঘুরছে। সূর্যের চারপাশে প্ল্যানেটগুলো বা গ্রহগুলো যেভাবে ঘুরছে, ঠিক সেভাবে। বলা হলো, এই এটমগুলোই সেই উপাদান। পরে পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা গেল, কেবল এটম-ই তা নয়। নিউট্রন প্রোটন ইলেক্ট্রনগুলোও তা-ই। পরে আবার বলা হলো, নিউট্রন প্রোটন ইলেক্ট্রনও সেই মৌলিক উপাদান নয়। এগুলোর মধ্যে প্রোটনের গঠনে যে পার্টিকেলগুলো আছে সেগুলো কোয়ার্কস (QUARKS) নামে পরিচিত। তিনটি কোয়ার্কস দিয়ে একটি প্রোটন-নিউট্রন তৈরি।

এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন, কোয়ার্কস-ই একমাত্র মূল উপাদান নয়। তাহলে এই মূল উপাদানের শেষ কোথায়? একটা জিনিস আপনারা লক্ষ করেছেন কি? ধীরে ধীরে এই জটিলতা গভীর থেকে গভীর হচ্ছে। এটা অনেকটা কসমিক ওনিয়ন বা মহাজাগতিক পেঁয়াজের মতো। পেঁয়াজের একটা খোসা ছাড়াচ্ছেন তো ছাড়াচ্ছেনই। শেষ হচ্ছে না। তবু একসময় পেঁয়াজের খোসারও শেষ আছে। কিন্তু এর নেই। যা আমরা জানতে পারছি, তার চেয়ে জানতে পারছি না অনেক বেশি। যখনই একটা নতুন কিছু জানছি তখন আরেকটা নতুন জ্ঞান এসে বলছে, এটা ঠিক নয়, আরো কিছু আছে। অনেক কিছুই আছে। এ বিষয়টি আরো ভালো করে বুঝতে হবে।

আমাদের এখানে কিছুদিন আগপর্যন্ত অবিশ্বাসীদের অনেকের মনেই একটা ধারণা ছিল যে, আমি যা দেখি না, যা বুঝি না, যা আমার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ে অনুভূত হয় না, তাকে আমার অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারে না। মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, 'সিয়িং ইজ বিলিভিং'–এটাই একমাত্র সত্য নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রদের ফিজিক্সের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে প্রায়ই আমি একটা কথা বলি–একটা হাতিকে দেখ, একটা মটরশুঁটিকেও

দেখ, তার চেয়ে ছোট জিনিসকেও দেখ। অনেকে সুচের ফুটো কিংবা একটা বালুর কণা-ও দেখতে পারো। কিন্তু একটা এটমকে দেখা যায় না কেন? তাহলে 'দেখা' জিনিসটা কী? অনেকেই বলতে পারে না এর মানে।

যেমন : আমি আপনাদের দেখছি। আলোকতরঙ্গ আপনাদের ওপরে পড়ছে, আপনাদের ওপর পতিত আলোকতরঙ্গ আবার আমার চোখে এসে পড়ছে। এখানে একটি ক্যামেরা অবস্কুরা আছে। সেটা একটা ফটোগ্রাফিক সিস্টেম বা অপটিক্যাল সিস্টেম। এই সিস্টেমে আপনাদের কিন্তু আমার উল্টো দেখার কথা ছিল। কেন যে আমি আপনাদের সোজা দেখছি, জানি না। চোখের অপটিক নার্ভ আমাদের ব্রেনে যে সিগন্যাল পাঠায়, তাতে এই ইমেজটা উল্টো হয়ে যায়। কিন্তু কীভাবে আমরা তা সোজা দেখি, আমরা এখনো জানি না। বিজ্ঞান তার উত্তর আজও দিতে পারে নি।

এখানে মূল বিষয়টি হচ্ছে 'কাকে দেখছি' আর 'কী দিয়ে দেখছি'। যখন আলো থাকে না তখন আমি আপনাকে দেখি না। যেহেতু আলো এসে আপনার ওপর পড়ছে না, তাই আপনাকে আমি দেখতে পারছি না। কিন্তু বিষয়টি তো সে-রকম নয় যে, আপনার অস্তিত্ব নেই। আপনার অস্তিত্ব আছে, আমি এমন একটা উপকরণ পাচ্ছি না, যার মাধ্যমে আমি আপনাকে দেখতে পাব। এ-ক্ষেত্রে সেই উপকরণটা হলো আলো। এই আলোর তরঙ্গ এবং ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ মূলত একই জিনিস।

আলো, ইনফ্রারেড তরঙ্গ–এগুলো সবই ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ। এক্স-রে, গামা-রে, রেডিও-ওয়েভও তেমনি। তাহলে এই বিশাল জগতে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গের যে বিপুল কর্মকাণ্ড, এর কোনোটি আমরা দেখি, কোনোটি আবার দেখি না। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গের একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য আছে। তরঙ্গের ওঠানামাকে বলে ক্রেস্ট টু পিক্, পিক্ টু ক্রেস্ট। পিক্ টু পিক্ লেংথ্কে বলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য–যেমন, রেডিও তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত? রেডিওতে যে বলে, ২৫ দশমিক এত মিটার বা ৪৯ দশমিক এত মিটার। এই মিটারগুলো কী? এগুলো হলো তরঙ্গদৈর্ঘ্য। এগুলো দর্শনেন্দ্রিয় বা আমাদের দেখার অনুভূতি জাগায় না। দেখার অনুভূতি জাগায় লাইট ওয়েভ বা আলোকতরঙ্গ।

আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মাত্র পাঁচ হাজার এংগ্স্ট্রম। এক এংগ্স্ট্রম হলো এক সেন্টিমিটারের ১০ কোটি ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ মাত্র পাঁচ হাজার এংগ্স্ট্রম আলোক তরঙ্গ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়তে এসে লাগে। আর ওই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আলোক তরঙ্গটি যখন আমাদের চোখে এসে পড়ে শুধু তখনই

আমরা দেখতে পাই। এটিকে বাদ দিয়ে এখন আপনার চোখে রেডিও তরঙ্গ কিংবা গামা-রে ফেললে আপনি দেখতে পেতেন না। কারণ, এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য আমাদের দর্শনসীমার বাইরে।

আমরা এটম বা পরমাণুকে দেখতে পারি না কেন? এটমের আকৃতি হচ্ছে 10^{-8}cm, যা আমাদের দর্শনসীমার চেয়ে ১০০০ গুণ ছোট। অথবা বলা যায়, এটমের চেয়ে আলোকের দৈর্ঘ্য ১০০০ গুণ বড়।

এখন একটা হাতি বা কোনো বস্তুর ওপর যখন আলোকতরঙ্গ এসে পড়ছে তখন সেই হাতি বা বস্তু, যাকে আমরা দেখছি, তা যা দিয়ে দেখছি অর্থাৎ আলোকতরঙ্গ, তার চাইতে বড়। তাহলে আমি দেখতে পারি। এখন কল্পনা করুন যে, একটা ছোট্ট জিনিসের ওপরে বিরাট একটা জিনিস নিক্ষেপ করলে সেখানে বিচ্ছুরণ হবে, নাকি বড় জিনিসটা ছোটটাকে ঢেকে ফেলবে? আপনি যখন একটা এটমের (10^{-8}cm) গায়ে আলো (10^{-5}cm) ফেলছেন, সেই এটম আলোর চেয়ে ১০০০ গুণ ছোট জিনিস। ফলে সেটি তো আলোতে ঢেকে যাবে। আর সেজন্যেই বিচ্ছুরণ হবে না। সে কারণেই এটমকে আমরা দেখতে পাই না।

আপনি যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন যে, আপনি ছোট জিনিস দেখবেনই, তখন বলবেন, আমি অন্য আলোকতরঙ্গ ব্যবহার করব। গামা-রে ব্যবহার করব। তখন দর্শনের অনুভূতি হবে না। নাই-বা হলো। কিন্তু একটা বিষয় হচ্ছে, যত তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমবে তত তার এনার্জি বাড়বে। X-ray-এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অত্যন্ত কম। ১ সেমি জায়গার মধ্যে অনেকগুলো তরঙ্গ গিজগিজ করে। যত এনার্জি বেশি হবে তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত ছোট হবে।

সুতরাং আপনি যখন বললেন যে, এটমকে আমি দেখব। সাধারণ আলো ফেললে তো সেটাকে দেখা যাচ্ছে না। কারণ ওই যে 'কাকে দেখছি' আর 'কী দিয়ে দেখছি'। যাকে দেখছি তা, যা দিয়ে দেখছি তার চাইতে বড় হতে হবে। এটমের (10^{-8}cm বা ১ সেমি-র ১০ কোটি ভাগের এক ভাগ) ওপর গামা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মতো ছোট জিনিস (অর্থাৎ 10^{-13}cm বা ১ সেমি-র লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ) যখন ফেলব তখন সেই রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে এলেও আমি দেখব না। কারণ স্রষ্টার দেয়া একটা বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আমার দর্শনের অনুভূতি হয়, যার সীমার বাইরে এই গামা তরঙ্গ। কিন্তু আমি একগুঁয়েমি করলাম যে, ওকে দেখবই–প্রয়োজনে যন্ত্রের সাহায্য নেব। এজন্যে আমি খুব শক্তিশালী তেজস্বী কণা বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহার করলাম। কিন্তু তখন?

এখন যেমন আলো দিয়ে আপনাকে দেখছি কিন্তু আপনি বদলাচ্ছেন না।

কারণ বড় জিনিসের জগতে তা হয় না। হিসেবনিকেশ এখানে অসুবিধা নয়। আপনার পজিশন এবং মোমেন্টাম এ দুটোর কোনটা কী অবস্থায় আছে, কীভাবে আপনি অবস্থান করছেন এবং আপনার ভরবেগ কী, এই দুটো জিনিস একই সময়ে নির্দিষ্ট করতে পারলে আমরা একটা জিনিসের স্টেট বা দশা বলতে পারি। কিন্তু ছোট জিনিসের বেলায় কী হলো? একটু ছোট জিনিসের জগতে আমি যেই দেখতে চাই–যেমন একটা গামা-রে পড়ল এটমটার ওপর। কিন্তু গামা-রে'র এনার্জিটা এতই বেশি যে, এটমকে ধাক্কা দেয়ার ফলে তার মোমেন্টাম অথবা পজিশন বদলে গেল। আর যে এটমকে আমি দেখব বলে স্থির করেছিলাম, সেই এটম আমার আর দেখা হলো না। তাহলে গামা-রে ফেলার আগে যদি এর পজিশন X হতো এবং মোমেন্টাম হতো P, গামা-রে'র ধাক্কার ফলে ঐ পজিশন ও ঐ মোমেন্টামে একটা আনসার্টেনিটি বা অনিশ্চয়তা এসে গেল। পজিশনের ক্ষেত্রে সেটি X, সামান্য একটু আনসার্টেনিটি। আবার সামান্য একটু মোমেন্টাম আনসার্টেনিটি X। X এবং P-এর গুণফল একটি ধ্রুবক । অর্থাৎ X P (=), হলো Planck's constant। এটাই হলো হেইজেনবার্গ-এর আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপল।

এসব বোঝাতে গেলে সময় লাগে। গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। আমাদের এই জগতের ছোট ছোট জিনিস বোঝার জন্যে এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা সূত্র। আমরা যখন একটা জীবকে পর্যবেক্ষণ করি, তখন জীবটা যাতে ধ্বংস না হয়ে যায় এমনভাবে পরীক্ষা করি। যেমন, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের যে বিবরণ, কোরআনে তা হুবহু আছে; লোকে আগে সেটা জানত না। কিন্তু এখন আল্ট্রাসনোগ্রাম করে ভ্রূণ যথাযথ অবস্থানে আছে কিনা, তা জানা যায়। এক্স-রে না করে এখন আলট্রাসনোগ্রাম করা হয়। বড় জিনিসের জগতে অর্থাৎ ম্যাক্রোস্কোপিক ওয়ার্ল্ডে দর্শকের সম্পর্ক ততটা নেই। অর্থাৎ দর্শক এখানে বড় ভূমিকা পালন করে না।

ছোট জিনিসের জগতে দর্শকের একটা ভূমিকা আছে। যখনই আমরা ছোট জিনিসের জগতে পৌঁছব তখন কী এজেন্ট আমরা ব্যবহার করছি, তা অবলোকন করব। সেই এজেন্টের সঙ্গে যাকে আমি দেখছি তার আন্তঃক্রিয়া হবে। ইউনিভার্স তৈরি করার পরে মানুষ সৃষ্টি করতে হলো কেন? গান আছে– *মানুষ বানাইয়া, খেলছ যারে লইয়া..*। মানুষ ছাড়া এ সৃষ্টি মূল্যহীন হতো। মানুষ হচ্ছে অবজার্ভার। অবজার্ভারহীন জগত সম্পূর্ণ মূল্যহীন। আর ছোট জিনিসের জগতে এই অবজার্ভারের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

আমরা যাকে 'মন' বলি, সেটাকে যদি আমরা ব্রেন বলে আইডেনটিফাই করি এবং ভাবি, 'মন' মানে হলো ব্রেন এবং এই ব্রেন একটি ক্ষমতাশালী জিনিস এবং তার মধ্যে অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে। আর কোনোদিন এর সমস্ত কার্যক্রম আমি যদি ভালোভাবে জানতে পারি, তবে আমি গোলাপকে কেন ভালবাসি বা এ ধরনের আবেগের রহস্য বুঝতে পারব।

আমরা মনকে সংগঠিত করে দেহের হাজারো অসুখ মন দিয়ে ভালো করতে পারি। আবার মন যদি ঘায়েল হয়ে যায়, তাহলে দেহ খারাপ হয়ে যায়। অনেক ডাক্তার আছে রোগীর সব অভিযোগ চুপচাপ শোনেন। রোগীও ভালো হয়ে যায়। বেশিরভাগ ডাক্তারই রোগীর কথা মন দিয়ে শোনেন না। অল্প সময়ে অনেক রোগী দেখার জন্যে ডাক্তার সময় দিতে পারেন না। যখন ডাক্তার ভালোভাবে কথা শোনেন তখন রোগী বাড়ি গিয়ে বলে, ডাক্তার খুব ভালো, আমার সবকিছু বিস্তারিত শুনেছে। এতেই তার রোগ অর্ধেক ভালো হয়ে যায়। সত্যিই সে সুস্থ হয়ে যায়। কয়টা ওষুধে কী কাজ হয়? শরীর নিজেই তো অনেকখানি নিরাময় করে। ওষুধ সেই নিরাময় প্রক্রিয়াকেই একটু ত্বরান্বিত করে। কিন্তু মূল কাজটা শরীরই করে।

দেহের মধ্যে কত বিলিয়ন সৈন্য আমাকে পাহারা দিচ্ছে! একটা যুদ্ধক্ষেত্রের মতোই বিভিন্ন র‍্যাংকের সৈন্যরা রোগজীবাণু সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, জীবাণুদের ধরাশায়ী করছে। অর্থাৎ এই দেহের ভেতরেই ডাক্তার কাজ করছে। ডাক্তারের কাজ হলো, আল্লাহ, তুমি যে শরীরটা দিয়েছ তাতে আমি এই ব্যান্ডেজটা করে দিলাম, ওষুধ দিয়ে দিলাম। সুস্থ করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি আমার কাজটুকু করে দিলাম মাত্র। রোগমুক্ত তুমিই করো। তোমার সিস্টেমই নিরাময় করবে। এই সিস্টেম তো তুমিই বানিয়েছ।

কাপড়চোপড় ম্যাচিং করার ব্যাপার যেমন আছে, তেমনি এরকম ম্যাচিং অপারেশনের বেলায়ও আছে। এটি হচ্ছে শরীরের টিস্যু ম্যাচিং। সূক্ষ্ম ম্যাচিং অর্থাৎ মাইক্রোস্কোপিক ম্যাচিং-এর ব্যাপারও আছে। ওষুধপত্র সব ঠিক আছে, কিন্তু আসল নিয়ন্ত্রণ আপনার ভেতরে। এ নিয়ন্ত্রণ আপনি অন্যের হাতে ছেড়ে দেবেন না কখনো।

যখন এটা বুঝতে পারবেন যে, নিয়ন্ত্রণ যদি অন্যকে না দিয়ে নিজের কাছে রাখা যায়, তবে নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। সিস্টেম কী, সাহস কী, প্রত্যয় কী, তা যদি জানেন, যদি মননকে ব্যাখ্যা করতে পারেন, তবে কোনো মেথড বাইরে থেকে আরোপ করতে হবে না। ভেতর থেকেই এ ব্যবস্থা আপনার কাজে লাগবে। সেজন্যে এ মেথড অনেকের প্রিয় মেথড।

কোয়ান্টাম মেথড একটি ইউনিভার্সাল প্রেসক্রিপশন হিসেবে এ পদ্ধতিটি চালু করেছে। কালের বিবর্তনে, সময়ের সাথে এটি আস্তে আস্তে আরো ভালো করে জানা যাবে। মন যে কত বড় আর রহস্যময় জগত, তা জানা যাবে। আর মনটাকে ভালোভাবে জানলে এবং মনের মাস্টার নিজে হতে পারলে সেই মন ও দেহ কী, তা বুঝতে পারা যাবে। তা হলেই আমরা আমাদের অসীম সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারব।

৭ নভেম্বর, ১৯৯৪ সালে ঢাকার বারডেম মিলনায়তনে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে বিজ্ঞানের আলোকে দেহ ও মনের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মন নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি এ সুদীর্ঘ ভাষণ দেন।

শুদ্ধ নিয়ত কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করে

আপনারা হয়তো আমার চেহারা আর অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে পারছেন যে, আমি অভিভূত। লামায় আসার কথা আমার অনেকদিন ধরে। অনেকবার চেষ্টা করেছি, নানা কারণে হয় নি। এবার স্রষ্টার অশেষ কৃপায় আমি আসতে পেরেছি। আমি সত্যিই অভিভূত। আর এই চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে যে একসঙ্গে এতজন চিকিৎসক গুরুজীর ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে এসেছেন, এটা স্রষ্টার এক অপার করুণা ছাড়া সম্ভব নয়। গুরুজী এখানে যে কাজ পরিচালনা করছেন, সেটাও অবশ্যই স্রষ্টার কৃপায়।

আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ–আমরা সবাই মিলে স্রষ্টার কাছে এ প্রার্থনা করব যে, এই কৃপা যেন উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। কারণ যে মানুষের ওপরে এই কৃপা থাকে, তিনি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। আর ভালো কাজ করলে কিংবা ভালো কাজের নিয়ত করলে এই সৌভাগ্য হয়, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনারা সবাই একটা ডিভাইন কাজের মধ্যে নিয়োজিত। সুতরাং আপনাদের বিশ্বাস হওয়া উচিত যে, এ সৌভাগ্য আপনাদের হবে।

আমরা জানি, ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামের মূল কথাই হচ্ছে শান্তি। আর এর সেন্ট্রাল পয়েন্ট হচ্ছে সেবা। আপনি যদি মনে করেন যে, আমার ঈমান আছে, নামাজ পড়ছি, রোজা রাখছি, সামর্থ্য থাকলে হজ করছি, যাকাত দিচ্ছি; অর্থাৎ মৌলিক সবগুলো বিষয়ই অনুসরণ করছি, তবে মনে রাখতে হবে যে, এগুলো মৌলিক স্তম্ভ। এর গাফিলতিতে মাফ নেই, এটা সত্যি। কিন্তু শুধু এ দিয়ে পার পাওয়ার উপায়ও নেই। অর্থাৎ এমন নয় যে, কেবল এই পাঁচটা স্তম্ভ অনুসরণ করলেই পার পাওয়া যাবে।

তাহলে কী করলে বেহেশতে যাওয়া যাবে? বেহেশতে যাওয়ার পথ সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে বলছেন যে, যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তারাই হবে এর অধিকারী। আর এই ভালো কাজের মধ্যে মানুষের, সর্বোপরি সৃষ্টির সেবাটা সর্বোত্তম। আর আপনারা যে সেবায় নিয়োজিত, সেটা

তো নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে পড়ে। সুতরাং গুরুজীর সাথে থেকে আপনারা যে কাজ করছেন, দুর্গত মানুষের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করছেন, এটা সত্যিই এক অনন্য সেবা। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে আপনারা নিশ্চয়ই সাফল্যমণ্ডিত হবেন।

এখানে আসার ঠিক একদিন আগে (২৪ জানুয়ারি ২০১৩) জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের মৃত্যুসংবাদ শুনলাম। তার সাথে আমার ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিচয় আর যোগাযোগ। তার অনেক চিন্তাভাবনা, মনের কথা তিনি আমাকে বলতেন। অত্যন্ত পছন্দ করতেন তিনি আমাকে। তার প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইউএসটিসি) একবার সমাবর্তন-বক্তা হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পরের বার মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টকে সমাবর্তন-বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন এবং বললেন যে, আমাকে তার সাথে যেতে হবে প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানাতে। আমি বললাম, আমি কেন? আপনি গেলেই তো হয়। কিন্তু তার এককথা–আপনি ভালো করে বোঝাতে পারবেন, আপনি চলুন। তার একটা ধারণা ছিল যে, আমি যদি তার সাথে যাই, তাহলে প্রেসিডেন্ট রাজি হবেন।

যা-হোক, গেলাম। কথা বললাম। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট রাজি হলেন। বললেন, নিশ্চয়ই যাব। প্রফেসর ইসলাম খুব খুশি হয়েছিলেন আমি তার সঙ্গে গিয়েছিলাম বলে। তিনি বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্স-এর একজন ফাউন্ডিং ফেলো, সেই সূত্রেও একসঙ্গে অনেক কাজ করেছি আমরা। ধূমপানবিরোধী আন্দোলন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে জীবনভর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন তিনি। সৎ-উদ্দেশ্য নিয়ে এসব কাজ করেছেন তিনি। আর মানুষের মনে যদি সৎ-উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে সে-সব কাজের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিতে হয়। এই ক্ষমার আদর্শটা আমরা পাই স্রষ্টার কাছ থেকে। স্রষ্টার একটা বড় গুণ হলো ক্ষমা করে দেয়া।

তাই কাজে যদি ভুল হয়–একথা মনে রেখে কাজে কখনো গতি কমানো যাবে না। যে কাজ করে না, সে ভুলও করে না। কারণ আসলে সে কোনো কাজই করে না। যে কাজ করে, ভুল তার হতেই পারে। সুতরাং আপনারা যদি কাজ করেন, ভুলত্রুটি হতে পারে; কিন্তু নিয়ত যদি ঠিক থাকে, তাহলে সেই কাজ সাফল্যমণ্ডিত হবে।

আমাকে লোকে বলে আমি ডিভাইন হেল্প পাই, আমাকে লোকে 'ইনস্টিটিউশন বিল্ডার' বলে। আমি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলাম একেবারে শূন্য থেকে, কিছুই ছিল না তখন এর। যে-কেউই তার কাজে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে এটা হয়। এর পরে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় করেছিলাম, সেখানে প্রায় একই অবস্থা। সেখানে কিছু উদ্যমী লোক আমি পেয়েছিলাম, যাদের সহযোগিতায় কাজ এগিয়ে গিয়েছিল। গোড়াতে সবাই সন্দেহ পোষণ করেছিলেন যে, আদৌ এখানে কিছু হবে কিনা। কিন্তু আমরা বলেছিলাম, অবশ্যই আমরা আমাদের কাজ করব। বিল্ডিং না পেলে, গাছতলায় হলেও প্রোগ্রাম হবে।

সেখানে প্রথম বছর ১০৭ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হলো। কিন্তু আমাদের নিয়ত ভালো ছিল। আল্লাহকে বললাম, সাহায্য করো। তাঁর সাহায্য পেলাম। সাড়ে আট বছর পরে যখন ওখান থেকে চলে আসি, তখন ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ১২ হাজার। আজকের এই যে লামা, এখানে এসেও আমার এ কথাগুলোই বার বার মনে হচ্ছে যে, আসলে সৎনিয়তে মানবকল্যাণের জন্যে কোনো কাজের উদ্যোগ নিলে আল্লাহ তাতে সাহায্য করেন।

আপনারা এতজন চিকিৎসক এখানে এসেছেন, কোনো জাগতিক সুবিধার জন্যে আসেন নি। একটা নৈতিকতা আর সেবার উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছেন। আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। এভাবেই একজন মানুষ অন্যের চোখে সম্মানিত হয়। আপনারা এখানকার বঞ্চিত মানুষকে চিকিৎসা দিয়েছেন, ওষুধ দিয়েছেন, সৎপরামর্শ দিয়েছেন–তারা অন্তরের গভীর থেকে আপনাদের জন্যে দোয়া করেছেন। এই দোয়াটা কিন্তু আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়।

গুরুজীকে আমি এখন থেকে 'ইনস্টিটিউশন বিল্ডার' বলব না; 'বিল্ডার' বলব। তিনি একজন নির্মাতা। তিনি লামায় স্থাপত্য নির্মাণ করেছেন, মানুষের মাঝে সৎচরিত্র নির্মাণ করে যাচ্ছেন, সর্বোপরি একটি সুন্দর আলোকিত প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছেন। হি ইজ অ্যা গ্রেট বিল্ডার। তিনি মানুষের ভেতরকার অমিত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলেন। সে লক্ষ্যে কাজ করে যান।

অধিকাংশ মানুষই জীবনের নানামুখী অস্থিরতার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে তার ভেতরের সম্ভাবনাটাকে বুঝতে পারে না, আবিষ্কার করতে পারে না। এ সম্ভাবনাটাকে বুঝতে হলে নিজের ভেতরের শক্তিটাকে কেন্দ্রীভূত করতে হয়। একটা সহজ উদাহরণ দিই।

ধরা যাক, রমনা পার্কে একটা ছোট্ট পানির পাত্রে একটা ডিম রেখে আসা হলো। সারাদিন চারদিক দিক থেকে সূর্যের আলো আসছে, কিন্তু সন্ধ্যায় গিয়ে ঠিকই দেখা যাবে, ডিম তো সেদ্ধ হয় নি। অথচ সেই পানির পাত্রটি যদি একটা ছোট চুলার ওপর রাখা হয়, তিন মিনিটের মধ্যেই দেখা যায়, ডিমটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ এখানে শক্তিটাকে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় তাপশক্তিকে

আমরা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে পেরেছি, সে শক্তিটা যত অল্পই হোক। শক্তিটা এখানে কনসেনট্রেটেড হয়েছে।

একজন মানুষ যখন তার ভেতরে প্রশান্তি খুঁজে পায় তখন এভাবেই সে তার শক্তিকে ফোকাস করতে পারে। কেন্দ্রীভূত করতে পারে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে গুরুজীর আলোচনায় এ বিষয়গুলো উঠে আসে। আর লামায় এসে তার বাস্তব প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছি। আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। এখানে এসে দেখলাম, মানুষকে কীভাবে জ্ঞানে, ধ্যানে, সংস্কৃতিচর্চা ও খেলাধুলাসহ সকল দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, আলোকিত করার চেষ্টা করছেন তিনি। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছেন মনুষ্যত্বের মর্যাদা।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি। সত্যি ঘটনা। একসময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন জেনারেল আযম খান। নানামুখী জনকল্যাণমূলক উদ্যোগের জন্যে এখানকার মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন তিনি। বাংলাদেশ থেকে একবার আমরা একটা অনুষ্ঠানে পাকিস্তান গেলাম। তখন তিনি ওখানে এসেছিলেন এবং বিভিন্ন কথাবার্তার মাঝে এই ঘটনাটা বলেছিলেন।

তিনি এখানকার গভর্নর থাকাকালে একবার এই পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিলেন। পথে এক পাহাড়ি লোকের সাথে দেখা। তিনি আবার লোকজন দেখলেই গল্প করতে ভালবাসতেন। লোকটাকে বললেন, আমি তো তোমাদের এখানে এলাম। কাল তোমাদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলতে চাই। তোমরা এসো। লোকটা বলে উঠল, আমরা আপনার ওখানে যাব কেমন করে? এখানে কি কোনো পথঘাট আছে? আমরা যেখানে থাকি, সেখান থেকে এই অল্প একটু পথ আসতেই অনেকখানি সময় লেগে গেল। আযম খান জানতে চাইলেন যে, লোকটা কোথায় থাকে এবং সত্যিই দেখলেন, ওখানে কোনো রাস্তাঘাট নেই।

এরপর তিনি তার অধঃস্তন অফিসারকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আমি কাল সন্ধ্যায় এই পথ দিয়ে হেঁটে যেতে চাই। অতএব আজ সকাল থেকে কাল সন্ধ্যার মধ্যে এখানে রাস্তা তৈরি করার ব্যবস্থা করো। কীভাবে করতে হবে, সেটা তুমিই ভালো জানো। পরের দিন সন্ধ্যার মধ্যে রাস্তা তৈরি হয়ে গেল।

পরদিন যথারীতি তার সাথে কথা বলার জন্যে এলাকার লোকজন এসেছে। এর মধ্যে আগের দিনের সেই লোকটিও ছিল। আযম খান তাকে চিনতে পারলেন। তার কাঁধে আলতো করে হাত রেখে বললেন, তোমার রাস্তা তো তৈরি হয়েছে। এখন তোমার কেমন লাগছে বলো। লোকটা তখন বলল,

আজকে আমি প্রথম মনে করলাম যে, আমি একটা মানুষ। এতদিন আমি নিজেকে মানুষের মধ্যে গণ্য করতে পারি নি।

বহুবছর আগের এই ঘটনাটা যখন তিনি আমাদের বলছিলেন, দেখি তার চোখে পানি। শুনতে শুনতে আমারও চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠছিল। এখানে, এই লামায় এসে দেখছি, এখানকার পাহাড়ি বাঙালি ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর শত শত ছেলেরা পড়াশোনা করছে, তারা নিজেদের মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখছে। মনুষ্যত্বের মর্যাদায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে। অথচ এখানে তো একদিন কিছুই ছিল না। আজকের এত সব সুযোগসুবিধার কথা তারা কোনোদিন চিন্তাও করে নি।

আমি বিশ্বাস করি, একদিন সত্যিই এখান থেকে বড় কিছু সৃষ্টি হবে। গুরুজীর এই শুভ উদ্যোগের ফলে এখানকার ছাত্ররা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে একদিন লামাকে সারা বিশ্বের মাঝে পরিচিত করে তুলবে। তাই আমি বলি, গুরুজী হচ্ছেন 'দ্য ল্যাম্প অব লামা'। লামার প্রদীপ। আর ওনাকে এই আলো জ্বালিয়ে রাখতে সাহায্য করছেন আপনারা সবাই, আপনাদের যার যার ক্ষেত্রে আন্তরিক সেবাদানের মাধ্যমে। আমি গুরুজী এবং কোয়ান্টামের সব সদস্যদের দীর্ঘজীবন ও সার্বিক কল্যাণ কামনা করি।

২৫ জানুয়ারি ২০১৩-তে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কোয়ান্টাম পরিবারের দেড় শতাধিক চিকিৎসকের অংশগ্রহণে লামায় অনুষ্ঠিত হয় একটি সুবৃহৎ মেডিকেল ক্যাম্প। এর পরদিন (২৬ জানুয়ারি) কোয়ান্টামমে আগত চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্য

রসুলের জীবনাদর্শ অনুসরণ ব্যক্তি ও সমাজকে সমৃদ্ধ করে

আমি ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করি। ইসলামের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্ক বুঝতে চাই। এবং গত তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে আমার বিশ্বাস যে, আমরা একটা গোল্ড মাইনের ওপর বসে আছি কিন্তু জানি না যে, এটা একটা গোল্ড মাইন। কোরআন আর হাদীস আমাদের জন্যে সেই গোল্ড মাইন বা সোনার খনি। এই সোনার খনি আমরা আবিষ্কার করতে পারি নি। আজকে আমি এর ওপর কিছু কথা বলব।

আজ আমরা এমন একটা সময় এ অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছি, যখন রবিউল আউয়াল মাস চলছে। আজ ১২ই রবিউল আওয়াল। রবিউল আওয়াল মাসের মর্যাদা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। পবিত্র কোরআনের সূরা আর-রাহমানে আমরা পড়েছি, প্রভুর কোন কোন দান বা নেয়ামতকে তুমি অস্বীকার করবে? আর প্রভুর সবচেয়ে বড় দান হলো, তিনি মানবজাতির জন্যে মুহাম্মদ (স)-কে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। এটা আল্লাহ নিজে বলছেন যে, 'হে রসুল, আপনার মধ্যে রয়েছে মানবজাতির জন্যে উত্তম আদর্শ।'

কিন্তু আমরা রোল মডেল খুঁজতে যাই কোথায়? একেকসময় যদি একেকজন রোল মডেল ঠিক করি, তবে জীবনে আট/ দশজন রোল মডেল এসে হাজির হবে। তখন সবাইকে অনুসরণ করা খুব মুশকিল হবে। কিন্তু আমাদের নবীজী–কেন তিনি একজন আদর্শ, কেন তিনি রোল মডেল; সে-সম্পর্কে আমি কিছু বলব। এছাড়াও আপনারা একটি সৎসঙ্ঘে গুরুজীর সাথে যে কাজ করছেন, সেটা মানবকল্যাণের পথে একটা বড় ধরনের উদ্যোগ। মানবতাকে সেবা করার যে অপরিসীম গুরুত্ব, সে বিষয়েও আমি বলব।

প্রথমত, রোল মডেল হিসেবে আমরা অনেকের কথাই চিন্তা করতে পারি। কিন্তু রসুল (স) শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্যে রোল মডেল। আপনারা জানেন যে, আমাদের রসুল কিন্তু রহমাতুল্লিল মুসলিমিন নন, তিনি রহমাতুল্লিল আলামিন। অর্থাৎ পুরো সৃষ্টিজগতের জন্যে তিনি

রহমতস্বরূপ। এটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার, কেন আল্লাহ একথা বললেন?

আমি পার্থিব জগতের রোল মডেলদের কথা বলছিলাম, যেমন : উইনস্টন চার্চিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ব্রিটেনকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অনেক বড় নেতা ছিলেন তিনি। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হলো, তখন নির্বাচনে দাঁড়ালেন এবং হেরে গেলেন। চারদিকে প্রশ্ন উঠল, কী ব্যাপার, এত বড় লিডার, বিশ্বযুদ্ধের সময় যিনি ব্রিটেনকে এভাবে নেতৃত্ব দিলেন, তিনি এরকমভাবে হেরে গেলেন? লোকে বলল, তিনি যুদ্ধকালীন ভালো নেতা, কিন্তু শান্তিকালীন দক্ষ নেতা না-ও হতে পারেন। যুদ্ধ শেষ, অতএব এখন অন্য কেউ আসুক।

ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছিল মাও সেতুং-এর বেলায়। মাও সেতুং চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটালেন। সেই বিপ্লবের পর, প্রথম যখন আমি চীনে যাই তখন দেখি সবাই মাও কোট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরে একটা সময় এলো, যখন চীনারা মাও-কে বলতে লাগল, তোমরা আমাদের অনেকখানি পিছিয়ে দিয়েছ। আর সেই মাও কোট কী জিনিস, সেটা এখন প্রায় কেউই জানে না ওখানে। অর্থাৎ এক সময়ের বড় নেতা, কিন্তু আরেক সময়ের নেতা নন।

আবার বলতে পারেন, অলি-আউলিয়া–এরা তো অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের। মিথ্যা কথা বলেন না, কখনো মানুষকে অকল্যাণকর কিছু বলেন না। যতরকম অসুবিধার মধ্যেই তারা থাকুন, তাদের কোনো কথা বা আচরণ কাউকে দুঃখ দেয় না। সবমিলিয়ে এত ভালো মানুষ, কিন্তু তারপরও তারা কেবল ধর্মীয় কিংবা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে রোল মডেল হতে পারেন, বাকি সব ক্ষেত্রে সেভাবে নয়। কারণ রাজনীতি বা সরকার পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা তেমন কোনো সক্রিয় ভূমিকা রাখেন না।

কিন্তু রসুল একদিকে ধর্মপ্রচার করছেন, মানুষকে আলোকিত জীবনের পথে ডাকছেন, অন্যদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, মসজিদে নববী-তে বসে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন। ওটা ছিল তাঁর সেক্রেটারিয়েট। আবার এই মসজিদে নববী যখন নির্মাণ হচ্ছিল তখন তিনি ইট বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। সবার সাথে কাজে সহযোগিতা করছেন।

অর্থাৎ সবদিকেই রসুলের ছিল একটা সময়োপযোগী ভূমিকা। এজন্যেই আমরা বলতে পারি যে, তিনি একজন রোল মডেল। পরিবার প্রধান, ধর্মীয় প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জীবনের অনেকগুলো ক্ষেত্রেই তিনি এর প্রমাণ রেখেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই রোল মডেলের কথা আমাদের

না যে, কেন তিনি একজন রোল মডেল। তাকে যদি আমরা অনুসরণ করি তবে আমাদের কাজ আর সামগ্রিক জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে।

একটা কথা জানা দরকার যে, ১৪শ বছর আগে যাকে রোল মডেল হিসেবে মানা হয়েছিল, এই প্রযুক্তির যুগে এখন এত নতুন নতুন আইডিয়া আসছে, এখনো তিনিই রোল মডেল?

১৯৩৬ সালে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে ইংরেজ লেখক ও মনীষী জর্জ বার্নার্ড শ বলেছিলেন, আজকের এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে যদি একজন মানুষ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, তিনি হচ্ছেন প্রফেট মুহাম্মদ (স)। কখন তিনি এটা বললেন? ১৯৩৬ সালে। অথচ মুহাম্মদ (স) পৃথিবীতে এসেছিলেন কখন? ১৪শ বছর আগে। আর এটা আমার-আপনার কথা নয়, পশ্চিমের লোকদের কথা। এছাড়াও বিশ্বখ্যাত বড় বড় নেতারা, যেমন : নেপোলিয়ান, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা অস্কার ওয়াইল্ডের মতো খ্যাতনামা সাহিত্যিক তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় লিখেছেন।

রসুলের জীবনী যারা পড়েছেন, তারা জানেন তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা সম্বন্ধে। বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা সংখ্যায় কত অল্প ছিলেন, আর ওদিকে বিপক্ষ শিবিরে কয়েক হাজার সৈন্য। কিন্তু কেন মুসলমানরা জিততে পারল? এর একমাত্র কারণ তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। তারাই আবার ওহুদের যুদ্ধে হেরে গেল কেন? রসুলের একটা মাত্র নির্দেশনা অনুসরণ না করার ফলে। তাঁর নির্দেশনা লঙ্ঘন করে তারা যুদ্ধক্ষেত্রের একটা দিক সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল গনিমতের মাল নিয়ে। এবং সেদিক দিয়েই শত্রুপক্ষ এসে আক্রমণ করল।

আবার তার ক্ষমার দৃষ্টিভঙ্গি দেখুন। ইকরামা ছিল একজন ইসলামবিরোধী। ঘোরতর বিরোধী। এদিকে মুসলমানরা যখন মক্কা বিজয় করলেন, তখন সে ভয়ে পালাতে লাগল আবিসিনিয়ার দিকে। কারণ তার ধারণা, রসুল তাকে পেলে একেবারে কচুকাটা করে ফেলবে। তার বোন দৌড়ে এলো রসুলুল্লাহ (স)-র কাছে। এসে রসুলকে বলল, আপনি তো জানেন যে, ইকরামা আপনার খুব বিরোধিতা করেছে। তিনি বললেন, জানি। তার বোন বলল, এখন সে পালিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন, পালিয়ে যাচ্ছে কেন? বলল, তার ধারণা, আপনি তাকে মেরে ফেলবেন। রসুল বললেন, কেন আমি তাকে মেরে ফেলব? বোন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, মারবেন না? রসুল যথারীতি বললেন, না। বোন জানতে চাইল, সে তার ধর্ম পালন করতে পারবে? তিনি উত্তর দিলেন, ধর্ম অনুসরণ তো যার

যার নিজস্ব ব্যাপার। সে তার মুক্ত বিবেক দিয়ে যে ধর্ম পালন করতে চাইবে, সে সেই ধর্মই পালন করবে। এ ব্যাপারে সে পুরোপুরি স্বাধীন।

বোন তখন ইকরামাকে গিয়ে থামাল। বলল সব কথা। ইকরামা বিশ্বাস করতে চাইল না। তার বোন তাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো রসুলুল্লাহ (স)-র সামনে। যে প্রশ্নগুলো এতক্ষণ বোন জিজ্ঞেস করছিল, সেগুলো সে আবার জিজ্ঞেস করল। রসুল (স) সেই একই উত্তর দিলেন। ইকরামা তখন রসুলের পায়ে পড়ে বলল, এই যদি ইসলাম হয়, তবে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। কিন্তু আমি এতদিন যত বিরোধিতা করেছি, তার প্রতিদান আমি দিতে চাই ইসলামের সেবা করে। আমাকে দয়া করে ইসলামের সেবা করার সুযোগ দিন। রসুল (স) তাকে সুযোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাকে জেনারেল বানিয়েছিলেন।

মুসলমানরা মক্কা বিজয়ের পর মক্কার অধিবাসীরা তো ভয় পেয়ে গেল। লোকজন সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েছে যে, এখন তো আমাদের মেরে ফেলবে। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চলবে। কিন্তু না, এর কিছুই সেদিন হয় নি। আর কত লোককে যে তিনি মাফ করে দিয়েছেন! যে হিন্দা তার প্রিয় চাচা হামজা (রা)-র সাথে চরম নিষ্ঠুরতা করেছিল, সেই হিন্দাকেও তিনি মাফ করে দিয়েছিলেন। এই ক্ষমা ছিল তাঁর একটা বড় গুণ। এবং সকল ধর্মের লোকের জন্যেই এটা তাঁর ছিল।

গোড়াতে মানুষ কিন্তু ইসলামের এই শান্তি আর সহিষ্ণুতাটা দেখেই এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এভাবে বিভিন্ন সময় মানুষের প্রতি ক্ষমা, দয়া, ভালবাসা আর যে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি রসুল তার জীবনে দেখিয়েছেন, তা অতুলনীয়। আজ দুঃখ লাগে যখন দেখি যে, কেউ কেউ মুখে অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা বলছেন কিন্তু সাম্প্রদায়িক আচরণ করছেন। কিন্তু আমরা রসুলের জীবন বিশ্লেষণ করে কী দেখেছি? মদীনা সনদে সবাইকে স্বাধীনভাবে যার যার ধর্ম পালনের অধিকার দিয়ে তিনি অসাম্প্রদায়িকতার যে অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন সেই ১৪শ বছর আগে, তার কোনো তুলনা হয় না। এই অসাম্প্রদায়িকতা আর সাম্যই ইসলামের আসল কথা। আর সমস্ত মানবজাতিই যখন এক সম্প্রদায়, সেখানে আমি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করবই বা কীভাবে?

এখন আমরা ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্রের কথা বলি। কোরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা নিজেদের কর্মাদি পরস্পরের সাথে আলোচনা করে করো'। গণতন্ত্রের এটাই তো মূলকথা যে, সবার মতামতের গুরুত্ব দেয়া, সবার সাথে

পরামর্শ করে কাজ করা। এ বিষয়গুলো তো শুরু থেকেই ইসলামে ছিল। আর একটা কথা বলি, আল্লাহর কাছে সারাজীবন যদি সেজদায় পড়ে থাকি, তবু আমার শোকরানা জ্ঞাপন শেষ হবে না। কারণ আল্লাহ আমাকে পৃথিবীর অনেক দেশ ঘোরার সৌভাগ্য দান করেছেন। আমি দেখেছি, বাংলাদেশের চাইতে অসাম্প্রদায়িক দেশ আর নাই। আর এটাই তো ধর্মবর্ণগোত্র নির্বিশেষে মানুষে মানুষে ভালবাসা ও একাত্মতার অন্যতম শর্ত। আমাদের দেশের এই আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির প্রশংসা করতে হয়।

এছাড়াও নিজের জন্যে চিন্তা করার পাশাপাশি অন্যের কল্যাণ ও সুযোগসুবিধার কথা ভাবার প্রতি ইসলামে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। নিজের ভালো, নিজের অধিকার সব প্রাণীই বোঝে। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী শুধু নিজেরটাই বোঝে। কিন্তু মানুষকে বলা হয়েছে অন্যের প্রয়োজনের প্রতিও মনোযোগী হতে। এটা না করলে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

এ প্রসঙ্গে একটা গল্প আছে। গল্পটা খুব মজার। আল্লাহকে একজন বলছে যে, আমাকে স্বর্গ এবং নরকটা একটু দেখাও, আমার খুব শখ। আল্লাহ তাকে দেখতে পাঠালেন। লোকটা গিয়ে দেখে, নরকে একটা বিরাট টেবিলের ওপর অনেক রকম উপাদেয় খাবার সাজানো। কিন্তু ওখানকার লোকজনের চেহারা ভীষণ জীর্ণশীর্ণ। সবাই অসুস্থ। লোকটা জিজ্ঞেস করল, এরকম এত ভালো ভালো খাবার অথচ তোমাদের চেহারা এরকম হাড্ডিসার কেন? নরকের বাসিন্দারা বলল, কী করব? এত ভালো খাবার থাকলে কী হবে, এখানে একটা নিয়ম আছে, যার কারণে আমরা কেউই এসব খেতে পারি না। সেটা হলো, আট ফুট লম্বা একটা হাতল দিয়েছে। ওই হাতল দিয়ে খাবার তুলে খেতে হবে। তো ওটা দিয়ে টেবিল থেকে খাবার টেনে আনতে আনতে সব খাবার পড়ে যায়। যতবার আনতে যাচ্ছি, সব পড়ে যাচ্ছে। আমরা আর খেতে পারি না।

লোকটা এবার স্বর্গে গেল। স্বর্গে গিয়ে দেখে যে, ওখানে সেই একই টেবিল, একই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। সেই একই আট ফুট লম্বা হাতল। কিন্তু স্বর্গের লোকেরা খুব মোটা তাজা, হাসিখুশি। কোনো দুঃখ নেই তাদের। এটা দেখে লোকটা ওদের বলল, তোমরা এখানে কী সুন্দর খেতে পারছ, কিন্তু নরকে ওরা খেতে পারছে না কেন? স্বর্গের বাসিন্দারা জানাল, ওরা কেন খেতে পারছে না, তা-তো জানি না, তবে আমরা সবাই মিলে একটা উপায় বের করেছি। ফলে সবাই সুন্দরভাবে তৃপ্তিমতো খেতে পারি। সেটা কীরকম? এখানে নিয়ম হলো, প্রত্যেকের খাবার একইভাবে টেনে নিয়ে খেতে হবে।

আমরা প্রথমে একজনকে বলি টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। তারপর হাতলটা দিয়ে খাবার নিয়ে ওকে খাইয়ে দিই। তার খাওয়া হলে সে এখানে আসে, বাকিরা একজন একজন গিয়ে দাঁড়ায়। এভাবে পালা করে খেয়ে আসে। এভাবেই পরস্পরকে সাহায্য করে আমরা খাওয়াদাওয়া করি।

গল্পটাতে একটা জিনিসই বোঝানো হয়েছে, স্বর্গ নরক সবখানেই একই সুযোগসুবিধা, কিন্তু পার্থক্যটা হচ্ছে অন্যকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে। আর ইসলামে এ বিষয়গুলোতে বার বার সচেতন করা হয়েছে। অন্যের ভালো-মন্দের দিকে মনোযোগ দিতে বলা হয়েছে। অথচ আজ আমরা দেখি সর্বত্র ঘুষ দুর্নীতি অনাচার। কোথাও শান্তি নেই। থাকবে কেমন করে? সমস্ত চিন্তা আত্মকেন্দ্রিক। সবখানে শুধুই নিজেকে নিয়ে চিন্তা–আমি কী করে বড়লোক হবো? আর আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় একটাই চিন্তা ছিল যে, একটি ফুলকে বাঁচাব বলে আমরা যুদ্ধ করি। যে মানুষ অন্যের জন্যে চিন্তা করে, অন্যের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাকে সবসময় অতিরিক্ত রিজিক দেন।

আমার সাথে বিভিন্ন কথাপ্রসঙ্গে গুরুজী বললেন, আমরা কাজের উদ্যোগ নিই, আর আল্লাহ সাহায্য করেন। তিনিই অর্থের ব্যবস্থা করেন। আমি বলি, গুরুজী যদি নিজের জন্যে করতেন, তাহলে এত পেতেন না। নিজের জন্যে করেন না বলেই তিনি এটা পান। যে-কোনো মানুষ, সে যদি শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত না থেকে অন্যের জন্যেও কাজ করে, তবে প্রভুই তার দেখাশোনা করেন। প্রভুর ওপরে এ বিশ্বাসটুকু থাকা খুব দরকার।

এ কথাটা সত্যি যে, আমরা যদি আমাদের দেশকে, আমাদের জাতিকে একটা উন্নত অবস্থানে নিয়ে যেতে চাই, তবে এ ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা সঠিক করতে হবে। ইসলাম আমাদের কী বলেছে, কোন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের তাগিদ দিয়েছে, সেটা আমাদের বুঝতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি।

প্রায় সাত/ আট বছর আগের কথা। রাশিয়ায় একটা কনফারেন্সে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমি গেলাম। সেই কনফারেন্সের উদ্দেশ্য হলো, রাশিয়ার সাথে কীভাবে ইসলামিক ওয়ার্ল্ডের মৈত্রীবন্ধন গড়ে তোলা যায়। রাশিয়ার অনেক বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিরা এসেছেন। একপর্যায়ে ওরা আমাকে বলল যে, এবার তুমি বলো, তোমার কথা শুনি। বললাম, আমি যা বলব সেটা পুরোটা তোমরা শুনবে তো? তাহলেই আমি বলব। ওরা বলল, শুনব বলেই তো তোমাকে এতদূর থেকে ডেকে আনলাম।

আমি বললাম, দেখ, আজ আমাদের যে দুর্গতি, এর অন্যতম কারণ কিন্তু তোমরা। তোমরা একসময় ইসলামকে মূল্যায়ন করেছিলে ডানপন্থী চেতনা হিসেবে। তোমাদের ভাষায় যার অর্থ দাঁড়িয়েছিল যে, ইসলাম হলো ব্যাকওয়ার্ড লুকিং, রেট্রোগেটরি, নন-প্রগ্রেসিভ, কনজার্ভেটিভ, ইনওয়ার্ড লুকিং ইত্যাদি। যত বাজে বাজে শব্দ আছে–সব রেখে দিয়েছ ইসলামের জন্যে। আর তোমাদের জন্যে রেখেছ ফরওয়ার্ড লুকিং, প্রগ্রেসিভ, হিউম্যানিস্টিক–সবরকম ভালো ভালো কথা। কিন্তু তোমরা যদি ভালো করে ইসলাম বুঝতে, তবে উপলব্ধি করতে পারতে যে, তুমি যতটা লেফ্‌ট তার চেয়ে বেশি লেফ্‌ট হলো ইসলাম। এটা আনফরচুনেটলি তোমরা বুঝতে পারো নি।

তুমি যদি এই টেবিলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাও, টেবিলটা তোমার বামে পড়ে। আবার তুমি যখন ওদিক থেকে ফিরে আসছ, তখন স্বাভাবিকভাবেই টেবিলটা তোমার ডানে পড়বে। কথা তো একই। এখন আর রাইট আর লেফ্‌ট বলে কী হবে? আর তোমরা তো এখন ফিরেই আসছ। সেটা কেমন?

প্রথমদিকে তোমরা যে কাজ করেছিলে তা অত্যন্ত ভালো কাজ করেছ–১৯১৭ সালে সংঘটিত অক্টোবর রেভুল্যুশন। সে-সময় ওই বিপ্লব যদি না হতো তবে লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধা আর দারিদ্র্যে মারা যেত, তোমরা সেটা ঠেকিয়েছ। কিন্তু ওটা তোমরা ধরে রাখতে পারো নি। তোমরা কী করলে? স্রষ্টার ওপর বিশ্বাসটাকে অস্বীকার করলে। কিন্তু এখন?

এখানে এসে আমি এক রোববারে দেখলাম, তোমাদের চার্চগুলো তোমরা খুলে দিয়েছ, ওখানে প্রার্থনা হচ্ছে। এজন্যেই তোমরা ফিরে এসেছ। এখন বাম-ডানের কথা বলে কী লাভ? আমাদের বাংলাদেশে সেক্রেটারিয়েটে মসজিদ আছে মাত্র একটি। কিন্তু তোমাদের এখানে ক্রেমলিনে আমি এখন দেখছি অনেকগুলো চার্চ, জার-এর শাসনামলের পরে এ চার্চগুলো তোমরা নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলে। কিন্তু এখন তো তোমরা খুলে দিয়েছ। তাহলে তো ধর্মে কোনো বিধিনিষেধ এখন তোমাদেরও নেই।

আর আমি নিজেও খুব আশ্চর্য হয়ে যাই–কে কখন কেন কবে কোথায় কীভাবে ইসলামকে একটা ডানপন্থী বা গোঁড়া চেতনা হিসেবে উপস্থাপন করেছিল, জানি না। এগুলো বলে বলে তারা ইসলামের অনেক ক্ষতিসাধন করেছে। তোমরা তো মার্কসইজমে বিশ্বাস করো। ইসলামে বলা আছে, ধন যেন ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়, এটা কি মার্কসইজমের কথা নয়? ইসলামে আছে, শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। এটা কি মার্কসইজমের কথা নয়? ইসলামে আছে, তোমার সম্পদে দরিদ্রের

অধিকার আছে। এটা কি মার্কসইজমের কথা নয়?

তোমরা কি মনে করেছ যে, শুধু নামাজ রোজা হজ–এটাই ইসলাম? যে দেশে সামাজিক ন্যায়বিচার নেই, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নেই, মানুষে মানুষে সাম্য নেই, সেখানে ইসলাম নেই; যতই ওখানে মসজিদ থাকুক আর উপাসনা হোক। যেখানে ন্যায়বিচার নেই, সেখানে ইসলাম নেই–এটা কোরআনের সবচেয়ে বড় কথা। ইসলাম যখন প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন বলা হলো, সব মানুষ সমান। দাস প্রথা আস্তে আস্তে চলে গেল, নারীদের ওপর যে অত্যাচার হতো, সেগুলো বন্ধ হয়ে গেল। অর্থনৈতিক বৈষম্য রদ হলো।

আমি যখন এ কথাগুলো বলছিলাম, ওরা চুপ করে শুনছিল। কারণ ওরা হয়তো বুঝেছে যে, ওরা খুব অন্যায় করেছে ইসলামের ওপরে এবং এটা করেছে ইসলামকে বোঝার চেষ্টা না করেই। পরদিন দেখি, রেডিও মস্কো আমার রুমে চলে এসেছে ইন্টারভিউ নিতে। তারপর দেশে ফিরে আসার পর ঢাকার রাশিয়ান দূতাবাস বলল, তুমি কী বলেছ, ওরা খুব ভালো রিপোর্ট দিয়েছে আমাদের। এরপর ঘন ঘন আমাকে ডাকে। আমি কয়েকবার মস্কো গিয়েছি ওদের আমন্ত্রণে।

আর আমাদেরও মনে করার কারণ নেই যে, এখানে লোকে নামাজ পড়ে বলে আমাদের দেশটা একটা ইসলামিক রাষ্ট্র হয়ে গেছে। সেটা হতো, যদি সমাজে সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হতো। আজকে আমাদের যে এত দুর্গতি, সেটা কি আমরা ইসলাম অনুসরণ করছি বলে? নাকি ইসলাম অনুসরণ করছি না বলে?

এ প্রশ্নটা আজ আমাদের সবার ভেবে দেখার সময় এসেছে। আজ যদি আমরা ইসলাম অনুসরণ করতাম, তবে জঙ্গিবাদের উত্থান হতো না। এত অশান্তি-ফ্যাসাদ ঘটত না। আল্লাহর রসুল নিজ এলাকায় ১২টা বছর নিগৃহীত হলেন, রাতের অন্ধকারে জন্মভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করলেন। তিনি কোনো যুদ্ধ করেন নি, যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ তার ওপর চাপিয়ে না দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা কী করছি? মনে রাখতে হবে, অশান্তির পথ, হিংসার পথ, ঘৃণার পথ কখনোই ইসলামের পথ নয়।

ইসলামের পথ হলো কল্যাণের পথ। সেবার পথ। এই সেবা হলো ইসলামের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। সেবা ছাড়া কখনো ভালো মানুষ, উন্নততর মানুষ হওয়া যায় না। আর এই সেবার জন্যে টাকাপয়সাই একমাত্র ব্যাপার নয়; আসল ব্যাপার হলো, নিয়ত বা আন্তরিক ইচ্ছা। ভালো কাজে টাকাপয়সা কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এটা এই লামায় এসে আরো ভালোভাবে বোঝা

যায়। আপনাদের সবার সম্মিলিত ইচ্ছা আর কাজের ফলেই সম্ভব হয়েছে এখানে এত কিছু করা।

আর সেবা যে আসলে কতভাবে করা যায়, তার কী কোনো হিসেব আছে? কারো গায়ে কাপড় নেই, তাকে একটা কাপড় দিয়ে দিন। ক্লান্ত একজন মানুষকে একটু বসার জায়গা করে বসতে দিন। আর যদি মনে করেন যে, কিছুই নেই আপনার, তাহলে আপনার যে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান বিতরণ করুন। সেটা একটা বড় সেবা। কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যান।

কেউ যদি কোনো আশার পথ খুঁজে না পেয়ে বিষণ্ন হয়, তবে তার পিঠে একটা সান্ত্বনার হাত রাখুন। এভাবে অসংখ্য উপায়ে, অসংখ্যভাবে ভালো কাজ করা যায়। আর কতটুকু সম্পদ থাকলে অন্যের সেবা করা যায়, অন্যের জন্যে দান করা যায়, সেটাও ইসলামে বলে দেয়া হয়েছে।

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা রসুলকে বলছেন, ওরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, কতটুকু দেবো? বলো, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছুই। অথচ আমরা সভ্যতার নামে কত কিছু করি, কত দিকে ব্যয় করি, কিন্তু এর কতটুকু আমাদের দরকার? আমরা চাইলে অত্যন্ত অল্পে আমাদের অনেক কিছু হয়ে যায়, অনেক প্রয়োজন পূরণ করা যায়। যদি তা-ই আমরা করতে পারতাম, তবে কোনো মানুষ, কোনো শিশু আজ অভুক্ত অবস্থায় ঘুমাতে যেত না। সবার মাথার ওপরে একটা ছাদ থাকত। সবার জন্যে সুপেয় পানির ব্যবস্থা থাকত, সবার শিক্ষার ব্যবস্থা থাকত, যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকত। বিশ্বজুড়ে মানবতা আজকে এমন নিপীড়িত, নিগৃহীত হতো না।

আমরা যদি রসুলকে আমাদের জীবনের রোল মডেল হিসেবে চিন্তা করি, তার জীবনাদর্শকে অনুসরণ করতে চাই, তবে আজ আমাদের সবারই সেই আলোকিত সমাজের জন্যে কাজ করে যাওয়া দরকার, যেমনটা রসুল করেছেন। আন্তরিকতা নিয়ে চাইলে আমরা অবশ্যই সেটা শুরু করতে পারব। আপনারা যারা এ প্রতিষ্ঠানের কর্মী হয়ে এই দুর্গম অঞ্চলে কাজ করছেন, তারা সেই লক্ষ্যেই আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি প্রার্থনা করি, এই আন্তরিক প্রচেষ্টা স্রষ্টা কবুল করুন এবং আপনাদের কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

লামার কোয়ান্টামম-এর কর্মীদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্য,
জানুয়ারি ২০১৩

বিশ্বমানের মানুষ হিসেবে তোমরা বেড়ে ওঠো

আমরা বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বকে বলি কসমস। আর তোমাদের স্কুলের নাম কসমো স্কুল। নামের মধ্য দিয়েই এর একটা বিশালত্ব আর বড় আয়োজন এখানে অনুভব করা যায়।

যা-ই হোক, প্রথমেই আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব যে, তোমরা সবাই বিশ্বমানের জ্ঞানী হবে। লামার প্রেক্ষাপটে নয়, চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে নয়, বাংলাদেশের কিংবা এশিয়ার প্রেক্ষাপটে নয়; বরং সারা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে তোমাদেরকে যেন গণ্য করা হয় বিশ্বমানের মানুষ হিসেবে। লেখাপড়ায়, চরিত্রে, শৃঙ্খলায় সমস্ত দিক দিয়ে তোমরা সারা পৃথিবীতে অনন্য হও, তোমাদের জন্যে এই দোয়াই আমি করি।

আমি তোমাদের কিছু জিমন্যাস্টিক ক্রীড়া-কৌশল দেখলাম, প্যারেড দেখলাম এবং সব জায়গায় তোমরা যেভাবে ভালো করছ তাতে আমি নিশ্চিত যে, এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং তোমাদের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্কুল-কলেজ পেরিয়ে ধাপে ধাপে বিশ্ববিদ্যালয় হবে। এই স্বপ্ন শিগগিরই বাস্তবায়ন হবে ইনশাল্লাহ।

আমি তোমাদের স্কুলে এসে কয়েকটা ক্লাসে গেলাম। প্রথমে মনটা একটু খারাপ হয়েছিল মেয়েদের না দেখে। কিন্তু গুরুজী এবং তোমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বললেন যে, তোমাদের যে বোনেরা এখনো শিক্ষার আলো পায় নি, তাদেরকেও বছরখানেকের মধ্যেই এখান থেকে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। এটা খুবই জরুরি। কারণ একটা পরিবারের নারী-পুরুষ সবাই যদি শিক্ষিত না হয়, তাহলে সেই পরিবারকে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত পরিবার বলা যায় না। আর একটি পরিবারে যদি একজন শিক্ষিত মা থাকে, তাহলে ওই পরিবারে কেউ কখনো নিরক্ষর থাকতে পারে না। সুতরাং আমরা আশা করব, লামার আলোকবর্তিকা হিসেবে যে মহান স্বপ্ন নিয়ে গুরুজী কাজ শুরু করেছেন, সেটা ক্রমেই বিকশিত হবে।

এই লামা, এই পরিবেশ তোমরা দেখছ ছোটবেলা থেকেই। তখন নিশ্চয়ই এখানে আজকের মতো এত কিছু ছিল না। তোমাদের চলাচলের জন্যে সুন্দর পথ হচ্ছে, রাস্তাঘাট হচ্ছে, পুষ্টিকর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। দূর থেকে আসা-যাওয়ার অসুবিধা যাতে না হয়, সেজন্যে আবাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে। অনেক কিছুই হচ্ছে তোমাদের এখানে। এজন্যে তোমরা সবসময় সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাবে।

আমি যখন জিজ্ঞেস করেছি যে, তোমরা কেমন আছ, তখন তোমরা বললে, শোকর আলহামদুলিল্লাহ! বেশ ভালো আছি। এতে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন। তোমরা সবসময় শোকরানা জ্ঞাপন করবে যে, এত কিছুর মধ্য দিয়ে তোমাদের সামনে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে। দ্বিতীয়ত, শোকরানা জ্ঞাপন করবে গুরুজীর প্রতি–তিনি এখানে এত দূরে, এত কষ্ট করে অনেকের সহায়তায় এই জায়গাকে আলোকিত করার জন্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

এখন তোমাদের সাথে কিছু খেলাধুলা করব। এজন্যে আমার দুজন ভলান্টিয়ার দরকার এবং তাদের উচ্চতা জানা প্রয়োজন। একজন পুরুষ ভলান্টিয়ার এবং একজন নারী ভলান্টিয়ার। এখানে তো ছাত্রীরা নেই, তাই আমাদের শিক্ষিকাদের মধ্য থেকে একজনকে আমরা নেব।

ভলান্টিয়ার দুজন দুপাশে দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়াও। এখন একজন তাদের উচ্চতা মাপো। তারপর এক পাশ থেকে আরেক পাশ পর্যন্ত (এক হাতের মধ্যমার অগ্রভাগ থেকে অন্য হাতের মধ্যমার অগ্রভাগ) দৈর্ঘ্য মাপো। একই রকম হলো কিনা? এবার মহিলা ভলান্টিয়ারের উচ্চতা ও পাশাপাশি দৈর্ঘ্যও এভাবে দেখা হোক। দুটোতেই একই ফলাফল আসছে কিনা?

অর্থাৎ ওপরে-নিচে আর পাশাপাশি দুদিকেই একজন মানুষের উচ্চতা সমান, তিনি পুরুষ হোন বা নারী। এ এক অনন্য গাণিতিক হিসাব। ডিভাইন প্রোপোরশন। আল্লাহ তায়ালা তোমার শরীরের মধ্যে এই গণিত রেখে দিয়েছেন। কী অপূর্ব!

অনেক জোরে ও বহুদূরে শব্দ পৌঁছে দিতে আমরা মাইক ব্যবহার করি, এখন যেমন করছি। তোমার গলার মধ্যেও তেমনি মাইক আছে। ক্যামেরা আছে তোমার চোখে। চোখ-ক্যামেরা। আবার একটা জিনিস টেনে তুলছ। অর্থাৎ একটা মেকানিক্যাল ডিভাইস তোমার শরীরে আছে। আর কী করছ?

আচ্ছা এখন একটু চোখ বন্ধ করে ভেবে বলো তো, গতবছর ঠিক এই দিনে তোমরা কোথায় ছিলে? সেই ছবি কল্পনা করতে পারছ? (*ছাত্ররা সমস্বরে*

: বাড়িতে ছিলাম) যদি ওই ছবি কম্পিউটারে রেখে দিতে তাহলে একটা বাটন টিপতেই সবকিছু চলে আসত, আবার দেখতে পেতে। তাই না? কিন্তু এখন তুমি কম্পিউটার না দেখেও একটু ভেবে বলে দিতে পারছ। বাড়ির ছবি, বাড়ির আশপাশের অসংখ্য ছবি তোমার মস্তিষ্করূপী কম্পিউটার সযত্নে রেখে দিয়েছে। কিন্তু এর জন্যে কোনো চেষ্টা বা পয়সা খরচ করা লাগছে না। বিনা চেষ্টায়, বিনা পয়সায় সবকিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে হচ্ছে। তাহলে প্রতিমুহূর্তে শুকরিয়া করা অর্থাৎ স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানানোটা যে কী জরুরি, তা বুঝতে পারছ? প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমাদের এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময়ও এটা করা উচিত।

আমি জানি, তোমরা এখানে মেডিটেশন করো, নানারকম সুন্দর সুন্দর ছবি কল্পনা করো, ঝর্নার শব্দ শোনো। বাইরের সব কোলাহল থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও নিজেকে। তাতে তোমার মনটা সতেজ হয়ে ওঠে। আর এভাবে তোমরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারো।

এটা কোয়ান্টামের একটা বড় দিক যে, এখানে এসে মানুষ নিজের আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলতে পারে। একবার আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারলে আশা করি, পৃথিবীর যে-কোনো দেশে তোমাদের বয়সী অন্যান্য ছেলেমেয়েরা যা করতে পারে, তুমি তার চেয়েও অনেক ভালো কিছু করতে পারবে। কারণ তারা যে প্রভুর সৃষ্টি, তোমরাও সেই একই প্রভুর সৃষ্টি। প্রভু আমাদের সবাইকে সমান করে পাঠিয়েছেন। তারা যদি পারে, তোমরাও পারবে ইনশাল্লাহ।

আমি তোমাদের অভিনন্দন জানাই যে, ইতোমধ্যেই তোমরা পড়াশোনা ও জাতীয় পর্যায়ের খেলাধুলায় নানারকম সাফল্য অর্জন করেছ। এর পাশাপাশি যারা এখানে তোমাদের পড়ান, ক্লাস নেন, বিভিন্ন বিষয় শেখান, খেলাধুলায় প্রশিক্ষণ দেন, তাদেরকেও আমি বিশেষ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আরেকটি কথা আমি তোমাদের বলব, নিজেকে কখনোই ছোট মনে করবে না। মনে রাখবে, পৃথিবীর যে-কোনো কিছুতে তোমার অধিকার আছে। সব মানুষ সমান। আবার কেউ যদি বড় হতে চাও, তবে নিজের গুণে বড় হও। তোমার চর্চা করার ক্ষমতা আছে। এখন আমি ছোট আর বড়-র ব্যাপারে তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।

এখানে এই ব্ল্যাকবোর্ডে একটি সরলরেখা আঁকলাম। এবার আমি এটিকে ছোট করতে চাই। এখন বলো, কীভাবে এই কাজটা করতে পারি? আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতাম, তখন একবার এটা ছাত্রদের জিজ্ঞাসা

করেছিলাম। একজন ছাত্র বলেছিল, স্যার, সরলরেখাটিকে একটু মুছে দিলেই তো হয়ে যায়। কিন্তু দেখ, এটা মুছে দেয়ার দরকার ছিল না। এর পাশে যদি একটা বড় সরলরেখা টানো, তাহলে তো ওটা এমনিতেই ছোট হয়ে যায়। এটাই হলো সুস্থ প্রতিযোগিতা। যে জোরে দৌড়াতে পারে, ওকে পেছন থেকে টেনে ধরব না, ওর পথের মধ্যে এমন কিছু রাখব না, যাতে সে পড়ে যায়।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা হবে এমন যে, সে দৌড়াচ্ছে দৌড়াক, আমি ওর চেয়ে অনেক বেশি দৌড়াব, তাকে থামানোর দরকার নেই। আরেকজন বড় হয়ে গেছে, তাকে কাটার দরকার নেই। স্রষ্টা আমার মধ্যে যে গুণ দিয়েছেন, আমি সেটা দিয়ে আরো বড় হওয়ার চেষ্টা করব। এই প্রতিযোগিতাটাই স্রষ্টা পছন্দ করেন। তাই কাউকে কোনোদিন কোনোভাবে মুছে ছোট করতে যেও না। কারো কীর্তিকে ছোট করতে যেও না। তাকে বরং সাহায্য করো যে, তুমি আরো বড় হও।

সেই গল্পটা তো তোমরা জানো যে, বাংলার বারো ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁ-এর সাথে মোঘল সেনাপতি মান সিংহের তরবারি যুদ্ধ চলছিল। একসময় মান সিংহের তরবারি ভেঙে যায়। ঈসা খাঁ তখন অনায়াসে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে পারতেন, হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না, বরং প্রতিপক্ষকে আরেকটি তরবারি নেয়ার সুযোগ দিলেন। এই মহানুভবতার জন্যেই তার কথা আমরা মনে রেখেছি। তাই তোমরাও যতদিন বেঁচে আছ, প্রত্যেককে সাহায্য করবে, যাতে সে বড় হতে পারে।

আর তোমার চেষ্টা থাকবে যে, নিজের গুণগুলোকে বিকশিত করে তুমি আরো বড় হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে বড় হবে। সংগীতে বড় হবে। সাহিত্যে বড় হবে। শিল্পে বড় হবে। বাণিজ্যে বড় হবে। খেলাধুলায় বড় হবে। কিন্তু কাউকে কখনো ছোট করবে না। এটাই সত্যিকারের প্রতিযোগিতা। যদি তা-ই করো, তাহলে তোমাদের জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। তোমাদেরকে নিয়ে গুরুজীর স্বপ্ন সার্থক হবে। তখন শুধু বাংলাদেশ নয়, এশিয়া নয়, সারা পৃথিবীর লোক তোমাদের কাজের মধ্য দিয়ে এই লামাকে চিনবে, তোমাদের স্কুলকে চিনবে। আমি গুরুজীর কাজের একজন ভক্ত। তোমরা দোয়া করো, যাতে আমিও তার এই কাজের সাথে আরো গভীরভাবে সম্পৃক্ত হতে পারি।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্য,
জানুয়ারি ২০১৩

জ্ঞানী হও, পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়ো

পরম করুণাময়ের কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে কয়েকটা কথা তোমাদেরকে বলতে চাই। প্রথমত, তোমরা যে এখানে পড়ছ, এটা কি উপভোগ করছ? পড়াশোনা তোমাদের ভালো লাগছে? পড়াশোনা ভালো না লাগলে এই পড়া কিন্তু তোমাদের মনের ভেতর ঢুকবে না। তাই যা-কিছু পড়বে, আগে সেটা বোঝার চেষ্টা করবে। বুঝে পড়বে। যদি না বোঝো, তবে হাত তুলবে; টিচার প্রয়োজনে আবার বলবেন। আবারো যদি না বোঝো, আবার হাত তোলো। একশবার হাত তোলো, যতক্ষণ বিষয়টা তোমার কাছে একেবারে ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার হয়ে না ওঠে।

তোমার চিন্তাটা হতে হবে এমন যে, প্রতিটা বিষয় আমাকে ভালো করে বুঝতে হবে। যদি না বুঝি তবে আমি জিজ্ঞেস করব, এতে কোনো ক্ষতি নেই। অন্যেরা কে কী বলল না বলল, তাতে কিছু আসে-যায় না। অর্থাৎ সবকিছু বুঝে পড়বে। মুখস্থ করার দরকার নেই। তুমি যদি বোঝো, তাহলে মুখস্থ করার কী দরকার? একবার বুঝলে সবকিছুই ঐকিক নিয়মের অঙ্কের মতো মনে হবে তোমাদের।

আর অঙ্ক যদি খুব ভালো করে শেখো, তাহলে দেখবে যে, জীবনে সবক্ষেত্রে যুক্তিবাদী হতে পারছ। সবকিছু যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারবে। একটা কথা তোমরা সবসময় মনে রাখবে, পৃথিবীর অন্য জায়গায় আমার বয়সী একটা ছেলে বা মেয়ে যা পারে, আমি তার চাইতে বেশি ছাড়া কম পারব না। বিশ্বাস রাখবে, তুমি এর চাইতে বেশি পারবে। কারণ তাকে যেভাবে স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন, তোমাকেও ঠিক একইভাবে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সে যদি পারে, তুমিও পারবে। শুধু চেষ্টাটা থাকতে হবে।

চেষ্টারও কিন্তু একটা নিয়ম আছে। যেমন, আকাশের দিকে যদি তীর ছোঁড়ার চেষ্টা করো সেটা আকাশে না গিয়ে গাছের আপেল পর্যন্ত তো পৌঁছতে পারে। তাই সবসময় আশাটা উঁচু রাখতে হবে যে, আমি অনেক ওপরে উঠতে পারি, আমি পারব।

আমি বিজ্ঞানী হলে পৃথিবীর প্রথম সারির একজন বিজ্ঞানী হতে পারি। আমি অর্থনীতিবিদ হলে পৃথিবীর সেরা অর্থনীতিবিদ হতে পারি। আমি খেলোয়াড় হলে পৃথিবীর নামকরা খেলোয়াড় হতে পারি। সংগীতজ্ঞ হলে খুব ভালো সংগীতজ্ঞ হতে পারি।

অর্থাৎ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মানুষ যা পারে, যা করা সম্ভব, তার সবটা তুমি পারবে। হাত যতদূর প্রসারিত করা যায় ততদূর প্রসারিত করবে। আর স্রষ্টাকে বলবে, হে প্রভু, আমি আমার হাত সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করেছি। তুমি তো বলেছ–তুমি কারো শ্রমকে বিফল করে দাও না। তুমি আমার শ্রমকে জয়যুক্ত করো। তারপর যদি কোনো কারণে সেটা না হয়, তুমি অন্তত নিজেকে বলতে পারবে যে, আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।

অনেকে হয়তো বলতে পারে, আমার ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে, তাহলে এত পড়াশুনা করে কী হবে? একটা উদাহরণ দেই। ধরা যাক, একজন কৃষক, সে ভালো ফসল ফলাতে চায়। এর জন্যে ভালো বীজতলা লাগে, বীজ বুনতে হয়, জমির আগাছাগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হয়, মাটি কর্ষণ করে দিতে হয়, নিয়মিত পানি দিতে হয়, সার দিতে হয় ইত্যাদি। এখন কৃষক খুব খুশি যে, আমি আমার কাজ করেছি। এখন ভালো ফসল হবে। এদিকে হঠাৎ কোথাও থেকে পঙ্গপাল এসে তার সমস্ত ফসল নষ্ট করে দিল। তখন কৃষক কি কখনো বলবে যে, আমার আর এত পরিশ্রম করে কী লাভ? যা হওয়ার তা-ই হবে।

না, কৃষক তা বলে না। ওটাকে ভাগ্য হিসেবে মেনে নিয়ে সে আবার ফসল ফলায়। আবার একই পরিশ্রম করে। কারণ ওটা না করলে ফসল ঘরে তোলার ন্যূনতম সম্ভাবনাও থাকবে না। তাই তোমাকে তোমার কাজটুকু করে যেতে হবে। সেইসাথে সবসময় আমাদের প্রভুর কাছে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে হবে।

আজ এখানে আমার পাশে গুরুজী বসে আছেন, তার একটাই উদ্দেশ্য যে, তোমরা মানুষের মতো মানুষ হয়ে পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়ো। শুধু বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে নয়, তোমরা যেন বিশ্বের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে পারো, সে উদ্দেশ্যেই ওনার এত সব কাজ।

এটা তিনি পারছেন কেন? কারণ তিনি স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস রেখে কাজ করেন। এজন্যেই তার কাজগুলো সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যার প্রমাণ তোমরা। তোমরা যে আজকে শুধু লামা বা বান্দরবানে নয়; বরং জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলায় ভালো করছ, এমনকি দেশের বাইরে যাচ্ছ, পড়াশোনায়

ভালো করছ–আমি দেখি, ওনার মনটা ভরে যায়। যারা তোমাদের নিয়ে কাজ করে, তারাও আনন্দিত হয়।

আরেকটা বিষয় হলো, প্রত্যেকটা জায়গায় একটা নিয়ম আছে। শুধু বাড়িতে বসে লেখাপড়া করলে তো হয়ে যেত, কিন্তু আমরা স্কুলে আসি কেন? এর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। এখানে একটা ডিসিপ্লিন শেখা যায়, সময়মতো অনেক কাজ করতে শেখো, তুমি সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে শেখো, অন্যের অধিকারের মর্যাদা দিতে শেখো। আর এগুলো সুন্দরভাবে চর্চার সাথে সাথে তোমার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে ওঠে।

আমার মনে হয়, তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক দিক থেকে ভাগ্যবান– তোমরা এখন প্রযুক্তির যুগে আছ। কম্পিউটার-ইন্টারনেটে অনেক কিছু শিখতে পারছ। ফলে তোমাদের কাজ অনেক বেড়ে গেছে। কারণ জ্ঞানের পরিধি যত বাড়ছে, তত জানার পরিধি বাড়ছে। আমাদের সময় এসব কিছু ছিল না। আমরা স্লেট-পেন্সিল দিয়ে লেখাপড়া শিখেছি। তোমাদের বয়সে আমরা যা জেনেছিলাম, এখন তোমরা সেটা অনেক বেশি জানবে।

আমার বিশ্বাস, এই জ্ঞান মানুষের সেবায় নিয়োজিত করবে। তুমি যদি মানুষের অসুখ সারাতে চাও, তাহলে ভালো ডাক্তার হতে হবে। একটা ভালো বিল্ডিং করতে চাও, তাহলে ভালো ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। যদি তুমি সবাইকে ভালো কাপড় দিতে চাও, তাহলে সেটা বানানোর কৌশল তোমাকে জানতে হবে। যদি বহু লোককে খাওয়াতে চাও, তাহলে কীভাবে বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারো, সেটা তোমাকে ভালো জানতে হবে। কৃষিবিজ্ঞান বুঝতে হবে। কারণ জ্ঞানই যদি না থাকে, তুমি সেবা করবে কী করে?

সব ধর্মগ্রন্থেই আছে, তোমাকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তুমি সেই জ্ঞান দিয়ে মানুষের উপকার করো। আর এর পাশাপাশি বাড়িতে তোমরা বাবা-মাকে সাহায্য করো কিনা? নিশ্চয়ই করবে। বাবা-মা যখন কোনো একটা কাজে তোমাদের সাহায্য চান, তবে তোমরা অবশ্যই তা করবে। পরম করুণাময় স্রষ্টাও সেটা পছন্দ করেন।

আজ সকালে তোমাদের স্কুলের যে-সব শিক্ষার্থীরা প্যারেড ও ডিসপ্লে করলে, তাদের নিপুণতার জন্যে আমি তোমাদের অভিনন্দন জানাই। এবং এর মাধ্যমে দেশের প্রতি যে অকৃত্রিম ভালবাসা তোমাদের প্রতি পদক্ষেপে, তোমাদের গানে, ডিসপ্লে-তে ফুটে উঠল, তার জন্যে আমি সত্যি গর্বিত। সেখানে একটা স্লোগান আমি দেখেছি–'অলিম্পিকে সোনা আমরা জিতবই'। এটা যদি সত্যিকারের প্রত্যয় হয়, তাহলে একদিন সোনা আমরা অবশ্যই

জিতব ইনশাল্লাহ। আর প্রত্যেকেটি অর্জনের পেছনে একটা কঠোর পরিশ্রম থাকে। সুতরাং আমরা যদি কঠোর পরিশ্রম করি, আমাদের দৃঢ়চিত্ততা থাকে, আমাদের লক্ষ্য স্থির থাকে, তাহলে একসময় আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছব। এতে কোনোরকম সন্দেহের কারণ থাকতে পারে না।

শহরের কোলাহল থেকে বেশকিছু দূরে তোমরা এখানে যে পরিবেশে পড়াশোনা করছ, সেটা অত্যন্ত মনোরম। এখানে সবসময়ই যেন বসন্ত, আর তোমরা তো জীবনের বসন্তেই আছ। এটাই তোমাদের নিজেদেরকে গড়ে তোলার সবচাইতে সুন্দর সময়। একবার যদি গড়ে ওঠো, একদিন হয়ে উঠবে দেশের সুনাগরিক। হয়ে উঠবে একজন বিশ্ব নাগরিক। সর্বোপরি হয়ে উঠবে একজন ভালো মানুষ। স্রষ্টার কাছে এই প্রার্থনাই করি।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্য,
মার্চ ২০১৪

ভবিষ্যতে মহাকাশ গবেষণায় নেতৃত্ব দিতে হবে

আমি সকাল থেকে টের পাচ্ছিলাম–আমাকে কিছু একটা সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যে সবাই চেষ্টা করছেন। সারপ্রাইজটা কেমন, ছোট না বড়, সেটা বুঝতে পারছিলাম না। এখন বুঝতে পারছি, মহাকাশ যেমন বিরাট, বিস্তৃত; এই সারপ্রাইজটাও তেমনি আমার কাছে একটা বিরাট ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কী অদ্ভুত একটা কো-ইনসিডেন্স! আজ বিকেলে এই স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে গল্প করছিলাম। নানারকম কথাবার্তা হচ্ছিল। কয়েকজন বলল, ওরা পাইলট হতে চায়। আকাশে উড়তে চায়। চাঁদে যেতে চায়। এখন দেখছি, এখানে শুধু আকাশ নয়, আকাশের ওপরে যে আকাশ অর্থাৎ মহাকাশ নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। এখানে (কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ) যে একটা মহাকাশ গবেষণা কার্যক্রম শুরু করার কথা ভাবা হচ্ছে, এটা ভাবতেই আমার দারুণ আনন্দ হচ্ছে। আর এই স্কুলের ছাত্রদের জন্যেও এটা একটা উল্লেখযোগ্য অর্জন হতে পারে।

আপনাদের সবার অবগতির জন্যে জানাই যে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথম রকেট নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। প্রথম যে মহাকাশের দিকে যাত্রা শুরু করে, সেটা কিছুদূর গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। এর পর ১৯২৬ সালে আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট গডার্ড অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের একটি রকেট তৈরি করেন। বেশিদিন আগের কথা নয় কিন্তু, একশ বছরও হয় নি।

এদিকে পঞ্চাশের দশকে সোভিয়েতরা যখন স্পুটনিক তৈরি করল, তখন আমেরিকা ঠিক করল, তারা অদূর ভবিষ্যতে চাঁদে মানুষ পাঠাবে। আর এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, তাদের হাইস্কুলের ম্যাথমেটিকস কারিকুলামটি একদম পরিপূর্ণভাবে নতুন করে ঢেলে সাজাবে। কারণ এর মধ্যে অনেক গাণিতিক হিসাবনিকাশের ব্যাপার আছে, সেজন্যে স্কুল পর্যায় থেকেই ওদের তৈরি করা। যা-ই হোক, ১৯৬৯ সালে তারা চাঁদে মানুষ নামাল।

সেই সময় একটা বড় সমালোচনার ঝড় উঠেছিল যে, এই পৃথিবীতে এখনো কত মানুষ খেতে পায় না, পড়তে পারে না, কত মানুষের মাথার ওপর ছাদ নেই, জরা-ব্যাধি ইত্যাদি হাজারো সমস্যা। এসব সমস্যার সমাধান না করে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করে মানুষ মহাশূন্যে যাচ্ছে, এটা কি ঠিক হচ্ছে? এর পক্ষে-বিপক্ষে দুদিকেই অনেক যুক্তি আছে সত্যি, তবে একটা কথা বলতে পারি–আজকে কম্পিউটারের যে অগ্রগতি, সেটা কিন্তু এমনি এমনি হয় নি; এই মহাকাশ গবেষণার ফলেই কম্পিউটারের জগতে অনেকখানি অগ্রগতি হয়েছে।

আপনারা তো জানেন, কোনো একটা জিনিস ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে সেটা নিচের দিকে নেমে আসে গ্র্যাভিটেশন ফোর্স বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে। কিন্তু রকেট বা স্পেসশিপ যখন মহাকাশে পাঠানো হয় তখন নিচের দিকে জ্বালানি পোড়ানো হয়, গ্যাস নিচে জ্বলতে থাকে আর রকেটটা ওপরে যায়। আমাদের ডিঙ্গি নৌকা যে প্রিন্সিপল মেনে চলে, রকেটও অনেকটা একইভাবে চলে। থার্ড ল অব মোশন। ডিঙ্গি নৌকায় দাঁড়টা পেছন দিকে টানলে যেমন ওটা সামনের দিকে যায়, এখানেও ঠিক তা-ই। তবে এখানে আরো অনেক ধরনের উচ্চতর প্রযুক্তি আছে। কারণ গ্র্যাভিটেশন ফোর্স অতিক্রম করে যাওয়া সহজ কথা নয়, এটা যে-কোনো সময় পড়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই বস্তুকে যদি সেকেন্ডে সাত মাইলের বেশি গতিতে ছোড়া হয়, তখন সেটি গ্র্যাভিটেশন ফোর্স অতিক্রম করে চলে যেতে পারে।

কিন্তু জিনিসটা যদি ভারী কিছু হয়, তাহলে উঠতে অসুবিধা। সেজন্যে আবার হিসাবনিকাশ দরকার, কম্পিউটার দরকার। সুতরাং কম্পিউটারকে যত সূক্ষ্মভাবে এখানে ব্যবহার করা যায় তত ভালো। আর কম্পিউটার তো তখন আজকের মতো এত ছোট ছিল না। বিরাট বিরাট হলের মধ্যে বিশাল একেকটা কম্পিউটার থাকত। সেই কম্পিউটার মেইনফ্রেম থেকে মিনি হলো, মিনি থেকে মাইক্রো হলো। তারপরে পিসি বা পার্সোনাল কম্পিউটার হলো। তারপরে কোলে চড়ল–ল্যাপটপ হলো। এখন তো আরো ছোট হচ্ছে। একসময় ফিঙ্গারটিপে চলে আসবে হয়তো। এভাবেই এই স্পেস জার্নি কম্পিউটার গবেষণায় একটা বিপ্লবের সূচনা করেছিল।

এখন মহাকাশ গবেষণায় স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীতে কোথায় কী সম্পদ আছে, কোথায় কে কী করছে, না করছে–তা আমরা জানতে পারি, বুঝতে পারি। এখন এই স্যাটেলাইট প্রযুক্তি এতটাই বিকাশ লাভ করেছে আর স্পেস রেজ্যুলেশন এত ভালো হয়েছে যে, অনেক দূর

থেকে আমরা পৃথিবীর প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদা করে বুঝতে পারি। আমরা বুঝতে পারি নদীগুলোর কী অবস্থা, বুঝতে পারি শস্যের ফলন কেমন হবে ইত্যাদি।

তরুণ বয়সে আমি যখন আনবিক শক্তি কেন্দ্রের পরিচালক ছিলাম, তখন এগুলো নিয়ে বিস্তারিত জানার ও গবেষণা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখনই বুঝেছিলাম, একদিকে পৃথিবীর সমস্যা সমাধান করা উচিত, তার পাশাপাশি মহাবিশ্বের অনুসন্ধান আর মহাকাশ অভিযানের কাজটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহনক্ষত্র নিয়ে বিশাল আমাদের এই মহাবিশ্ব। আমাদের জীবনযাপন জীবনধারণ সবকিছুর সাথেই এর নানাভাবে যোগ। এই সূর্য যদি না থাকত, আমরা কি টিকে থাকতে পারতাম? সূর্যের অভ্যন্তরে যে নিউক্লিয়ার রি-একশনগুলো হয়, সেগুলো না হলে আমরা কি সূর্যরশ্মি এবং তাপশক্তি পেতাম? যদি সাত দিন এই সূর্যের আলো না আসে তাহলে কি সালোক-সংশ্লেষণ হবে? অন্ন বস্ত্র বাসস্থান সবকিছুর জন্যেই তো প্রয়োজন বৃক্ষ, সেই বৃক্ষ কি বাঁচবে? অর্থাৎ মহাকাশ দিয়ে আমাদের জীবন প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত ও সমৃদ্ধ হচ্ছে। জোয়ার-ভাটার ওপর চন্দ্রের যে প্রভাব, সেটাও আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে বিভিন্নভাবে।

আর গবেষণার প্রয়োজন তো আছেই। সৌরজগতের পৃথিবী নামক গ্রহটিতে যেমন মানুষের বসতি রয়েছে, সে-রকম অন্য জায়গায় অন্য কোনো প্রাণী আছে কিনা, সেটা দেখার জন্যেও পবিত্র কোরআনে নির্দেশনা আছে। সুতরাং আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে অনেক গভীরে। আমাদের জানতে হবে মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় সম্পর্কে।

সাধারণ একটা ছোট গণ্ডি ছেড়ে যখন আমরা একটা বড় গণ্ডির দিকে ধাবিত হই তখন খরচের কথা চিন্তা করি, কিন্তু মনের যে বিস্তৃতি ঘটে, সেটি চিন্তা করি না। মনের বিস্তৃতি যখন ঘটে তখন মনে হয়, মহাবিশ্বের মধ্যে একটি কসমিক ভিলেজে আমি একজন মানুষ আমার অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে আছি। মনটা তখন সমুদ্রের মতো উদার হয়ে যায়।

এই গ্রহনক্ষত্রসহ পুরো মহাবিশ্বের সবকিছুর কাছেই আমার অনেক ঋণ। কারণ যে-সব এলিমেন্টস আমরা মাটি থেকে পাই, যেমন : আয়রন–এগুলো পৃথিবীতে তৈরি করা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে তৈরি হয়ও না। যে-সব জিনিস আমাদের দরকার তা সূর্যের অভ্যন্তরে তৈরি হচ্ছে। কোনো একটা বৃহৎ বিস্ফোরণে সে-সব জিনিস আমাদের এখানে চলে এসেছে। বিষয়টা হলো, যে

অণু-পরমাণু এ পৃথিবীতে আছে, মাটি থেকে যে-সব এলিমেন্টস আমার ভেতরে ঢুকছে, সেগুলো একসময় এসেছে নক্ষত্র থেকে। অর্থাৎ আমি একসময় নক্ষত্রের অংশ ছিলাম। সেইসূত্রে আমি মহাবিশ্বের একটি অংশ এবং প্রত্যেকে আমরা নিজেদেরকে মহাবিশ্বের অংশ হিসেবে দাবি করতে পারি।

মহাকাশ গবেষণার ফলে একদিকে যেমন স্রষ্টার সৃষ্টিকৌশলে যে প্রজ্ঞাপ্রসূত পরিকল্পনা, যে অসাধারণ রচনাশৈলী, সেটা আবিষ্কার করা যায়, তেমনি গবেষণায় আমরা আরো অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারি। আমরা একটা উন্নয়নশীল দেশ। অনেক সীমাবদ্ধতা আছে আমাদের। কিন্তু মহাকাশ গবেষণার দু-ধরনের দিক আছে। একটা হলো পরীক্ষামূলক বা গবেষণামূলক দিক, অন্যটা হলো তাত্ত্বিক দিক। এখনকার একজন বড় বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। তিনি কিন্তু হুইল চেয়ারে বসে জীবন কাটাচ্ছেন, কথা বলতে পারেন না। কিন্তু তার মন মহাবিশ্বে ভ্রমণ করে।

সুতরাং গণিতে যদি আমাদের পারদর্শিতা বাড়ে, বিজ্ঞানে যদি আমরা দক্ষ হই, তাহলে আমরা আশা করতে পারি, এই শতাব্দীতেই এই শিক্ষাঙ্গন থেকে কিছু মানুষ তৈরি হতে পারে, যারা একদিন নাসাতে কাজ করবে। যারা মহাকাশ অভিযানে অংশ নেবে।

আজকে খুব ছোট পরিসরে মনে হলেও, এই যে ধারণাটির সূচনা ও উৎপত্তি গুরুজী এখানে করলেন, আমি বিশ্বাস করি, সেটি বিকশিত হয়ে একটি বিরাট বৃক্ষে পরিণত হবে একদিন। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের আজকের এই ক্ষুদে শিক্ষার্থীরাই একদিন মহাকাশ গবেষণায় নেতৃত্ব দেবে। এবং এর ফসল শুধু বাংলাদেশ নয়, বরং সারা বিশ্ব পাবে। আমি আশা করি, মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে মহাকাশ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় আমরাও কিছুটা অবদান রাখতে পারব। আমি এই মহৎ প্রচেষ্টার সার্বিক অগ্রগতি কামনা করে এই মহাকাশ গবেষণা কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজে 'প্রফেসর ড. এম শমশের আলী মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র' উদ্বোধনের পর দেয়া বক্তব্য, মার্চ ২০১৪

হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করছে কোয়ান্টাম

আমি তো আপনাদের সামনে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলি। আপনারা অনেকবারই শুনেছেন আমার কথা। কিন্তু আজ আমি আপনাদের কাছ শুনতে চাই–এই যে আপনারা কোয়ান্টামে এলেন, বিভিন্নভাবে এর সাথে জড়িয়ে আছেন এবং গুরুজীর সাথে কাজ করছেন–আপনাদের কেমন লাগে?

(সবাই সমস্বরে : বেশ ভালো লাগে)

ব্যস্, এটাই হচ্ছে সব কথার বড় কথা। যে কাজ ভালো লাগে সেই কাজ করতে পারলে, এর চেয়ে বেশি আনন্দের আর কিছু নেই। আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেমেয়েদের পড়াতাম, তাদের বলতাম–তোমরা ফিজিক্স পড়ছ কি এই জন্যে যে, আর কোনো সাবজেক্টে চান্স পাও নি? মেডিকেলে চান্স পাও নি, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চান্স পাও নি, তাই কি ফিজিক্স পড়তে এসেছ? আগে নিজেকে প্রশ্ন করে দেখ যে, ফিজিক্স কেন পড়তে চাও? তোমাদের মধ্যে যদি এমন প্রতিভা থাকে যে, কেউ সুন্দর বাঁশি বাজায় কিংবা আর কেউ অন্য কিছু পারে, তবে সেটা করে তুমি সারা পৃথিবীকে একদম মত্ত করে দিতে পারবে। তাই আমি ফিজিক্সের টিচার হয়েও তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, তুমি সেই বাঁশিই বাজাও এবং সেই পথে খুব ভালোভাবে এগিয়ে যাও। তাই ফিজিক্স ভালো না লাগলে এখনই বলো। আর ভালো লাগলে থেকে যাও। আসলে ফিজিক্স ভালো লাগানোর দায়িত্বটা তো কিছুটা আমাদের শিক্ষকদেরও।

একটা ঘটনা বলি। একবার লন্ডনে একটা পার্টিতে এক তরুণের সাথে আলাপ হলো। সে বলল, আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। আমি বললাম, খুব ভালো। তারপর সে বলল, স্যার, আমি কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র ছিলাম। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে ফিজিক্স পড়তে এলে কীভাবে? সে বলল, স্যার, আপনি ফিজিক্সের স্কেল-এর ওপর ইউনিভার্সিটিতে ১২টা লেকচার দিয়েছিলেন, আমার এক বন্ধু একটা লেকচার শুনে এসে আমাকে

বলল, চল, পরের লেকচারটা শুনতে যাই। এই স্কেল-এর ওপর লেকচার শোনার জন্যে আমি ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে আসি। আপনার ১২টা লেকচার শোনার পর আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে ফিজিক্সে চলে আসি। আমি সেদিন স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানালাম যে, অন্তত একজন তরুণকে হলেও ফিজিক্সের মাহাত্ম্যটা আমি বোঝাতে পেরেছি।

বিংশ শতকের আমেরিকান তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান। তিনি ছিলেন আমার অন্যতম মেন্টর। তার একটি উক্তি আছে, If you study anything in it minutest details it becomes a part of physics. অর্থাৎ যা-কিছু নিয়ে আপনি গবেষণা করবেন, বুঝতে চাইবেন, জানতে চাইবেন–হোক সেটা যত বড় কিংবা ছোট–তার সবকিছুর মধ্যেই শেষ পর্যন্ত ফিজিক্স আছে। আমাদের ব্রেন-এ যে ওয়েভ বা তরঙ্গ আছে, সেগুলো যেভাবে কাজ করে, তার মধ্যেও আছে ফিজিক্স।

কোয়ান্টাম মেথডের মাধ্যমে মনোসংযোগ করে আপনার চেতনা যখন আপনি একদিকে ধাবিত করেন, আপনার ব্রেনটাকে আলফা ওয়েভে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, এর মানে হলো আপনি মস্তিষ্কের পুরো কার্যক্ষমতাকে একদিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। অটোসাজেশনও মূলত তা-ই। হিউম্যান সিস্টেম আসলে শুধু একটিমাত্র সিস্টেম নয়, অনেকগুলো সিস্টেমের সমন্বয় ঘটেছে এখানে। মেডিটেশনের মাধ্যমে গুরুজী ধীরে ধীরে সেই রহস্যাবৃত জগতের সাথে আপনাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিচ্ছেন।

কোয়ান্টামের আরেকটি বিষয় আমাকে খুব বেশি আকৃষ্ট করে–'সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন'। অর্থাৎ শরীর মন সবদিকেই সর্বতোভাবেই ভালো থাকার চেষ্টা, নিজেকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখার চেষ্টা। এটা খুব জরুরি। কারণ নিজে শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ না থাকলে, ভালো না থাকলে আপনি কখনো অন্যের সেবা করতে পারবেন না। অন্যের কল্যাণ করতে পারবেন না।

আর অন্যের সেবা করতে না পারলে আপনাকে পৃথিবীতে পাঠানোর পেছনে স্রষ্টার যে উদ্দেশ্য, তা কোনোদিন সাধন হবে না। কারণ মানুষকে পৃথিবীতে শুধু নিজের জন্যে, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যে পাঠানো হয় নি। তা-ই যদি হবে, তাহলে মানুষের সঙ্গে জগতের অন্যান্য প্রাণীর তফাত কোথায়? অন্য সব প্রাণী কেবল নিজেকে নিয়ে চিন্তা করে, নিজের প্রাপ্তিটার কথা চিন্তা করে সবার আগে। কিন্তু মানুষ নিজের অধিকারের পাশাপাশি অন্যের অধিকার আদায়ের কথাও চিন্তা করে।

একটা গল্প বলি এ প্রসঙ্গে। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের একটা লেখায় আছে এটা। এক মহিলার ওপর ভীষণ অত্যাচার করত তার স্বামী। তাদের একটা সন্তান ছিল। একসময় অত্যাচারের মাত্রা যখন ছাড়িয়ে গেল তখন মহিলা ভাবল, এভাবে মার খেয়ে এখানে আর পড়ে থাকা যাবে না। এদিকে ওই মহিলার দুঃখের কথা শুনে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল আরেক লোক, দুজনের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা সখ্যতাও গড়ে ওঠে। স্বামীর অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠলে মহিলা ঠিক করল, ঐ লোকের সাথে সে পালিয়ে যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে একটা বনের মধ্যে তারা দুজন একত্রিত হওয়ার কথা, ওখান থেকে পালিয়ে যাবে। যথারীতি মহিলা গিয়ে বসে আছে। নির্জন প্রকৃতির মধ্যে সে নানান চিন্তাভাবনা করছে। অনেক দেরিতে একসময় সেই লোকটা এলো। এসেই হঠাৎ জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মহিলাকে। মহিলা তো খুব অবাক। এত দেরি করে এলো, আবার আমাকে এভাবে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, কী ব্যাপার?

লোকটা বলল, তুমি কি জানো, তুমি কোথায় বসেছিলে এতক্ষণ? প্রকাণ্ড একটা সাপ লেজ গুটিয়ে বসে আছে ওর ডিমের ওপর। তুমি এতক্ষণ ওর পাশেই বসে ছিলে। তুমি খেয়াল করো নি। তোমার ভাগ্য ভালো যে, ঐ সাপটা নিজের ডিমের ওপর বসেছিল। ডিমটাকে অরক্ষিত রেখে তোমাকে আক্রমণ করার ইচ্ছা হয়তো সাপটার ছিল না, তাই বেঁচে গেছ।

একথা শুনে মহিলার একটা ভাবান্তর হলো। হঠাৎ সে বলল, আমি কোথাও যাব না। একটা সাপ যদি তার ডিমটাকে ছেড়ে না যেতে পারে, তবে আমারও তো একটা সন্তান আছে। আমি যাব না। আমি ভুল করছিলাম, যত অত্যাচারই হোক আমি আমার ছেলেকে নিয়ে নতুন করে আমার জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করব। এখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। তার নিজের ভেতর এমন একটা ডিফেন্স মেকানিজম আছে–যত কষ্টই তার হোক, সে অন্যের কথাও ভাবতে পারে।

যা-ই হোক, আজকে গুরুজী এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসেছেন, কাজ করছেন, এর উদ্দেশ্য একটিই–এখানকার অবহেলিত দুর্গত মানুষকে একটা সুস্থ সুন্দর আলোকিত জীবন গড়তে সাহায্য করা। তাদের মন-মানসিকতাকে ভালো কিছুর জন্যে তৈরি করা। আর মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার যে কত আয়োজন হতে পারে, আমি তা উপলব্ধি করেছি লামার এই কোয়ান্টামমে এসে। পৃথিবীর সব জায়গায় সব মানুষ যদি এভাবে মানুষকে ভালবাসতে

পারে, তাহলে পৃথিবীটা একটা সুন্দর জায়গা হয়।

আজ বিকেলেই আমি এই স্কুলের (কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ) ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলছিলাম। কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কী হতে চাও? কয়েকজন বলল, আমরা পাইলট হতে চাই। আমরা আরো দূরে যেতে চাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দূরে কোথায়? চাঁদে যেতে চাও? ওরা বলল, হাঁ, চাঁদে যেতে চাই।

অর্থাৎ যে বঞ্চিত মানুষগুলো এতদিন জীবনের ন্যূনতম সুযোগসুবিধাটুকুও পায় নি, তারা এখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে চাঁদে যাওয়ার। আমি মজা করে বলছিলাম, এরা এতদিন পাহাড়ি ছিল, এখন আকাশী হতে চায়। আসলে এদের মধ্যে এখন ইতিবাচকতার বিশ্বাসটা এমনভাবে দৃঢ় হয়েছে আর এমন আশার সঞ্চার হয়েছে যে, এরা সত্যিই ভাবতে পারছে–স্কাই ইজ দ্য লিমিট। আর বিহাইন্ড দ্য সিন অর্থাৎ এর নেপথ্যে রয়েছেন আপনারা, যারা গুরুজীর নেতৃত্বে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আমিও নানানরকম কাজে ব্যস্ত থাকি, কিন্তু গুরুজী যখন আহ্বান জানান, আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে আসি। তার ভালবাসার ডাকে সাড়া না দিয়ে আমি পারি না। হয়তো পারবও না কোনোদিন।

আসলে মানুষের প্রতি মানুষের এই যে ভালবাসা, এটাই তো ধর্মের মূল কথা। ধর্মের শিক্ষা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ধর্মের সেই পথ থেকে আমরা আজ অনেকখানি সরে এসেছি। মানুষকে একত্রিত করার বদলে আজকে আমরা দেখছি, ধর্ম মানুষকে আলাদা করে ফেলেছে। অথচ ধর্ম কিন্তু অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক সুন্দর একটা জীবনব্যবস্থার সন্ধান দেয় আমাদের। আমাকে একজন একটি কবিতা দিয়েছেন, কবিতার নাম 'আল কোরআন'। আমি পড়ে শোনাই আপনাদের :

যা ছিল কর্ম সঞ্চালনের গ্রন্থ, হয়ে গেল প্রার্থনা পুস্তক/ যা-কিছু ধ্যানের জন্যে, রয়ে গেল আবৃত্তির জন্যে/ জীবন্তদের বিধান ছিল, হয়ে গেল মৃতদের ছাড়পত্র। জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাস্ত্র ছিল, পড়ে রইল মূর্খদের হাতে/ সৃষ্টি বশ করার আহ্বান ছিল, থেমে রইল মাদ্রাসার পাঠক্রমে/ প্রাণহীনকে চেয়েছিল প্রাণবন্ত করতে, লেগে গেল বিদেহীদের পরিত্রাণ কল্পে/ ওহে মুসলমান, এ তুমি কী করলে?/ চোখ মেলো আর ভেবে দেখ ॥

এই কবিতাটা যিনি লিখেছেন, তিনি মুসলমান নন। তিনি হচ্ছেন ভারতবর্ষের নবম রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত ড. শংকর দয়াল শর্মা। তিনি অত্যন্ত ভালোভাবে কোরআন অনুধাবন করেছেন। তাই তিনি বলতে পেরেছেন এমন

কথা। আসলে এখান থেকেই সৃষ্টিকে জানার, স্রষ্টাকে জানার এবং মানুষের যে অমিত সম্ভাবনা–তা উদ্ধার করার যে উপায়, তা আবার আমাদের খুঁজে পেতে হবে। ধর্মের গভীরে প্রবেশ করতে হবে আমাদের। যার সূচনা ঘটবে প্রেমের মধ্য দিয়ে। প্রেমেই তার সৃষ্টি।

মনে রাখতে হবে যে, আমাদের স্রষ্টা মানুষকে শাস্তি দেয়ার জন্যে পৃথিবীতে আনেন নাই; মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সুতরাং ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুঃখজর্জরিত এই পৃথিবীতে যদি আমরা মানবকল্যাণের আদর্শকে ধরে রাখতে পারি, মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারি, মানুষের সাথে মানুষের হৃদয়ের সংযোগ ঘটাতে পারি, তাহলেই আমরা সার্থক হতে পারব।

এখানকার স্কুলের সংযোগপথে আজ সকালে একটা কালভার্ট উদ্বোধন করলাম আমরা। মনে হচ্ছিল, এ যেন অসংখ্য মানুষের হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের সংযোগ। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের ব্রিজ। কোয়ান্টামের কাজের মাধ্যমে মানুষে মানুষে এরকম অসংখ্য সেতু তৈরি হোক–প্রেমের সেতু, হৃদয়ের সেতু–এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

লামার কোয়ান্টামম-এর সর্বস্তরের কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভায় দেয়া বক্তব্য, মার্চ ২০১৪

সৎকর্ম ॥ মুক্তির পথ

সৎকর্ম ছাড়া সভ্যতা অচল, সমাজ অচল, পরিবার অচল, ব্যক্তি অচল। কথাগুলো সবাই জানে। কিন্তু এই জানা কথাগুলোই বার বার সকলকে মনে করিয়ে দিতে হয়। এটাকে বলা যেতে পারে এক ধরনের ব্যাটারি রিচার্জিং। এ প্রসঙ্গে আমার একটি গল্প মনে পড়ে গেল।

বেশ কয়েক বছর আগে বিসিএস একাডেমিতে আমি 'সততা' শীর্ষক একটি বক্তৃতা করেছিলাম। বক্তৃতা ও আলোচনা শেষে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসার সময় একজন অফিসার আমার কাছে এসে বললেন, স্যার, আপনার লেকচারটি আমার জীবনের মোড় আবার ঘুরিয়ে দিল।

আমি বললাম, কীরকম?

অফিসার উত্তর দিলেন, স্যার, আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলাম ঠিকই। কিন্তু তারপর চাকরিতে যোগদান করার পর অবস্থার চাপে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। আপনার কথায় আবার আমার হুঁশ হলো। আমি নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করছি, আর পথ হারাব না।

অফিসারটির সৎসাহস ও আত্মপর্যালোচনার সততা দেখে মুগ্ধ হলাম। তাকে উৎসাহ দিলাম। ধন্যবাদ জানালাম। আর মনে মনে বললাম, এটাকে বলা হয় ব্যাটারি রিচার্জিং।

জীবনে চলতে গেলে আমরা নানা ধরনের প্রলোভনের সম্মুখীন হই। মানুষকে এক অর্থে দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সব প্রলোভনের মোকাবেলা করতে হলে দৃঢ়চিত্ততা ও সততার প্রয়োজন। সেজন্যে সততার কথা একবার বললে হয় না, বার বার বলতে হয়। বার বার না বললে অনেক কথাই মানুষের মনে দাগ কাটে না। এজন্যেই বোধকরি স্রষ্টাও পবিত্র কোরআন শরীফে সঠিক পথের কথা বার বার বলেছেন।

বর্তমান সমাজে দুর্নীতি যেভাবে প্রতিটি ধাপে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, তাতে সকলকে শাস্তি দিয়ে পুরো দেশটাকে একটা জেলখানায় পরিণত করলে চলবে না। আসল কথা হচ্ছে, সৎ মানুষ তৈরি করতে হবে। আমাদের পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। একজন

সৎ ও শিক্ষিত নাগরিক দেশের জন্যে একটা সম্পদ, একথা আমাদের সকলকে বুঝতে হবে।

ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এগুলো ইসলাম ধর্মের অতি প্রয়োজনীয় স্তম্ভ। কিন্তু কেবল এগুলো আঁকড়ে ধরলেই যে বেহেশতে যাওয়া যাবে, তা কিন্তু বলা হয় নি। এগুলোর পাশাপাশি 'আমিলুস সালেহাতি' অর্থাৎ সৃষ্টির জন্যে ভালো কাজ বা সৎকর্ম করলে বেহেশতে যাওয়া যাবে–এ কথাই বলা হয়েছে পবিত্র কোরআনে। আর এই সৎকর্ম হচ্ছে সৃষ্টির সেবার মূল কথা। আর সৃষ্টির সেবাতেই স্রষ্টার সন্তুষ্টি।

আল্লামা প্রফেসর ড. এম শমশের আলী

বিশিষ্ট পরমাণুবিজ্ঞানী ড. এম শমশের আলী ১৯৬১ সালে ঢাকায় আনবিক শক্তি কমিশনে সায়েন্টিফিক অফিসার পদে যোগ দিয়ে তার কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি এ প্রতিষ্ঠানের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এর পাশাপাশি অসামান্য একাডেমিক ক্যারিয়ারের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ সালে তাকে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অনারারি প্রফেসর-এর বিরল সম্মানে ভূষিত করে। পরবর্তীতে ১৯৮২ থেকে দু-যুগ তিনি এ বিভাগের নিয়মিত অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তার একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য। সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিরও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

বিজ্ঞানের জগতে খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব প্রফেসর শমশের আলী বিশ্বের তিনটি সায়েন্স একাডেমির ফেলো–ওয়ার্ল্ড একাডেমি অব সায়েন্স, একাডেমি অব সায়েন্স অব দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড এবং বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্স (প্রেসিডেন্ট : ২০০৪-২০১২)। তিনি বাংলা একাডেমির একজন ফেলো।

বিজ্ঞানভাবনা প্রসারে সদা-উৎসাহী ড. আলী টানা এক যুগ বিটিভি-তে *বিজ্ঞান বিচিত্রা* ও *নতুন দিগন্ত* নামে দুটি নতুন ধারার শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ে সিরিজ লেকচার প্রদান করেন বিবিসি-তে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন ওয়ার্ল্ড একাডেমি অব সায়েন্স ও ইতালির থার্ড ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক অব সায়েন্টিফিক অর্গানাইজেশনের সম্মাননা।

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি ভূষিত হয়েছেন বহু গুরুত্বপূর্ণ সম্মাননা ও পুরস্কারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হরিপ্রসন্ন রায় স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্স স্বর্ণপদক, জগদীশ চন্দ্র বসু স্বর্ণপদক এর অন্যতম।

দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের প্রথমসারির সায়েন্টিফিক জার্নালগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে তার অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। এছাড়াও বিজ্ঞান, গণিত ও ইসলাম নিয়ে লিখেছেন বেশ কয়েকটি আলোচিত গ্রন্থ।

আল্লামা শমশের আলী এমন একজন মানুষ–চেনা ছকের বাইরে এসে যিনি দেখতে শিখেছেন মানুষ ও প্রকৃতিকে। বন্ধু ও কাছের মানুষেরা তাকে অভিহিত করেন *A man with a large antenna* বলে। বিজ্ঞানের পাশাপাশি কবিতা, সংগীত, সাহিত্য ও ধর্ম তার বিশেষ আগ্রহের বিষয়।

ISBN 978-984-33-8182-8